অর্থের সন্ধান

'কলির গান', 'অমৃত কথা' প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মজুমদার

প্রণীত

শিশির পাবলিশিং হাউস
১৯৭ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মূল্য—১৲ এক টাকা

প্রকাশক—শ্রীশিশির কুমার মিত্র বি, এ,
শিশির পাবলিশিং হাউস
১৯৭, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রিণ্টার—শ্রীশশিভূষণ পাল
মেট্‌কাফ প্রেস্‌
১৫নং নয়ানচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীট্‌, কলিকাতা।

বাঙ্গালার কর্ম্মবীর—

ভারতের গৌরব—

স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের

করকমলে—

এই গ্রন্থখানি

শ্রদ্ধার সহিত অর্পণ করিলাম।

গুণমুগ্ধ—গ্রন্থকার

সূচী

পরিশিষ্ট

ভূমিকা

ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারের উপর দেশের আর্থিক উন্নতি নির্ভর করে। বর্ত্তমানকালে নিত্য নূতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, দ্রুত যান বাহনাদির চলাচল ও সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থা বাণিজ্য-ক্ষেত্রকে একদিকে যেমন বিস্তৃত করিয়া তুলিয়াছে, অন্যদিকে ব্যবসা বাণিজ্যে বিভিন্ন জাতি ও ব্যক্তির মধ্যে প্রতিযোগিতাও কঠোর করিয়া তুলিয়াছে। এই কঠোর প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রে সামান্য লাভ করিতে হইলে যে সমস্ত গুণ অর্জ্জন করা ও উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক, তাহাই এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়।

মনোবৃত্তি গঠন, ভীতি ও দুশ্চিন্তা ত্যাগ, বিশ্বাস সৃষ্টি, উচ্চ অভিলাষ, উদ্ভাবনী শক্তি, সঙ্কল্পের দৃঢ়তা প্রভৃতি গুণাবলী কি ভাবে আয়ত্ত করা যায়, সে বিষয়ে গ্রন্থকার এই পুস্তকে আলোচনা করিয়াছেন। অর্থের উদ্ভব কি প্রকারে হইয়াছে এবং নানা প্রকার ধাতুর মধ্য হইতে কেবলমাত্র স্বর্ণ ও রৌপ্যকেই মূল্য নির্দ্ধারক সামগ্রী রূপে কেন স্বীকার করা হইয়াছে, তাহা অতি সহজ ভাবে এই পুস্তকে আলোচিত হইয়াছে।

যাঁহারা জীবন সংগ্রামে সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা অর্থনীতি ক্ষেত্রে সাফল্য লাভের একটী প্রধান উপায়। এই উদ্দেশ্যে গ্রন্থকার কয়েকজন কৃতকর্ম্মা ব্যবসায়ীর জীবনী এই গ্রন্থে আলোচনা করিয়াছেন। সার রাজেন্দ্র নাথ মুখো-

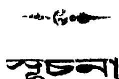
পাধ্যায়, হেন্‌রী ফোর্ড প্রভৃতি ব্যক্তিগণ অতি সামান্য আরম্ভ হইতে কি ভাবে বিরাট প্রতিষ্ঠান সমূহ গড়িয়া তুলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে সুচারুরূপে বর্ণিত হইয়াছে। সার রাজেন্দ্র নাথ কেবলমাত্র বাংলার ও বাঙ্গালীর গৌরব নহেন, তিনি সমগ্র ভারতবর্ষের আদর্শ স্থল। কি ভাবে স্বীয় চরিত্র ও অধ্যবসায় বলে সার রাজেন্দ্রনাথ বাণিজ্য-জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে মুগ্ধ হইতে হয়। হেন্‌রী ফোর্ডের ও স্বর্গীয় বটকৃষ্ণ পালের জীবনীও শিক্ষাপ্রদ।

পুস্তকখানির উদ্দেশ্য মহৎ ও প্রচার বাঞ্ছনীয়। ইতি—

সেনেট্ হাউস্
৭ই এপ্রিল, ১৯৩২।

শ্রীপ্রমথ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

অর্থের সন্ধান



সূচনা

পৃথিবীতে এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহারা নিতান্ত অলসতা-প্রযুক্তই চিরজীবন দারিদ্র্যভোগ করিয়া থাকেন। আবার এমনও অনেককে দেখা যায়, যাঁহারা যথেষ্ট কৃতবিদ্য এবং অর্থোপার্জ্জনে যথেষ্ট সচেষ্ট কিন্তু জীবনে কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। এতদুভয়ের জীবনে এই-যে অর্থনৈতিক ব্যর্থতা, কিরূপে ইহা নিবারিত করা এবং কিরূপেই বা মানুষের স্বভাবগত আলস্য দূর করিয়া, তাহার মধ্যে কর্ম্ম-প্রবণতা জাগ্রত করা যায়, এই সকল সমস্যা সমাধান করিবার চেষ্টা সকল দেশের মনীষী কর্ম্মী ও নেতৃবৃন্দ চিরদিনই করিয়া আসিতেছেন।

নিতান্ত দুঃখের বিষয় যে, নানা কারণে আমাদের দেশে অর্থকষ্ট দূর করিবার ও অর্থোপায়ের অসংখ্য প্রণালী সম্বন্ধে শিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত যুবকদিগকে জ্ঞান দিবার প্রণালীবদ্ধ চেষ্টা এখনও পর্য্যন্ত আশানুরূপ হয় নাই।

বর্ত্তমানে দেশের নিদারুণ বেকার-সমস্যা সমাধানে যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য করিবার আশায়, আমি এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানিতে আমার কর্ম্ম-জীবনে অর্জ্জিত বহু বৎসরের অভিজ্ঞতার ফল নিবদ্ধ করিলাম, অবশ্য ইহার পশ্চাতে পাশ্চাত্য অর্থনীতবিদ্ পণ্ডিত ও প্রতিভাবান্ কর্ম্মবীর-গণের আদর্শ ও অণুপ্রাণনা রহিয়াছে। আশা করি, এই পুস্তক পাঠে পাঠকেরা কিছু-না-কিছু উপকৃত হইবেন।

আর্থিক উন্নতির উপায় নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া, আমার এই ধারণা জন্মিয়াছে যে, ইহার মূলে এক স্বাভাবিক ও মৌলিক নীতি বর্ত্তমান। যে-কেহ এই নীতিদ্বারা কার্য্য-পদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত করিলে, তাঁহার চেষ্টা প্রায়শঃ ব্যর্থ হয় না। কেহ মনে করিতে পারেন যে, আমি এক দুঃসাহসিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি এবং উৎকট আত্মগরিমা প্রযুক্ত আমার বিশ্বাস ও ধারণাদ্বারা জ্ঞানাতীত এবং দুর্ব্বোধ্য কোন তত্ত্ব নিরূপণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। আমার সেরূপ কোনও আত্মশ্লাঘা কিম্বা আত্মগরিমা নাই। আমি কোনও নূতন আইনের আবিষ্কারক কিংবা নির্দ্দেশক হইতে চাহি না। আমি জানি, সত্যের কোন পরিবর্ত্তন হয় না—আজ যাহা সত্য, চিরকালই তাহা সত্য ছিল, এবং থাকিবে।

মানুষ চেষ্টা ও সাধনার বলে উহার সন্ধান পাইতে এবং উহাকে আয়ত্তাধীন করিতে পারে। অতঃপর এই নীতির সহিত সকল কার্য্যের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে পারিলেই তাহার মঙ্গল।

বাস্তবিক মানব-জীবনের মূলে সেই এক মহান্ নীতি (One Great Law) বর্ত্তমান এবং অন্যান্য সকল স্বাভাবিক নীতি (Natural Law) সার্ব্বজনীন ঐক্য-দ্বারা উহার সহিত সংবদ্ধ। প্রকৃতির এমন কিছুই কার্য্য নাই, যাহা অন্ধ-সম্ভাবনা (Blind chance), দৈবঘটনা বা অকারণে ঘটে। একখানি প্রস্তরখণ্ড পর্ব্বতগাত্র হইতে স্থানচ্যুত হইয়া পড়িতে পড়িতে গতিপথে কোন একটি বৃক্ষকে আঘাত করিল ! ফলে বৃক্ষ উৎক্ষিপ্ত হইয়া নদীমধ্যে পড়িয়া গেল। অতঃপর জল অবরুদ্ধ হওয়ায় উপকূল ভূমি প্লাবিত করিয়া উহার উর্ব্বরতা সাধন করিল। এই যে ক্রিয়ার পর ক্রিয়া সংঘটন, ইহা কি কেবল দৈবকৃত ? না, তাহা কখনই নয়। এই প্রস্তর খণ্ডের স্থানচ্যুতি একটি কারণের প্রক্রিয়ার প্রত্যুত্তরমাত্র, যাহা বহুদিন অবধি উহাকে ভাঙ্গিবার জন্য আয়োজন করিতেছিল এবং যাহার ফলে এই স্খলিত শিলার স্থানচ্যুতি এমনিই সময় হইল— যখন ক্রিয়ার স্বাভাবিক শক্তির বিকাশ সম্ভবপর হইয়াছে।

বিভিন্ন জাতীয় ঘড়িতে এক দিন, এক সপ্তাহ বা এক বৎসর পূর্ব্বে দম দিলে, তাহা যেরূপ যথানিয়মে সময়-নির্দ্দেশ করিয়া যায়, সেইরূপ পাথরের স্থানচ্যুতি এক অপরিবর্ত্তনীয় সঙ্গত নীতির ফল—কোনও শৃঙ্খলাশূন্য দৈবঘটনা নহে।

যদি কোনও ব্যক্তি এই নীতি এবং ইহার ক্রিয়া সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি ঐ প্রস্তর-নিহিত প্রচ্ছন্ন শক্তিকে আয়ত্ত করিয়া, প্রস্তর এবং বৃক্ষের পরস্পর সংঘর্ষে বাধা জন্মাইতে কিংবা উহাকে নিজের ইচ্ছানুযায়ী কার্য্যান্তরে নিয়োগ করিতে পারেন। ঐ প্রস্তরখণ্ড হয়ত সুবৃহৎ অট্টালিকা কিংবা রাস্তা নির্ম্মাণের উপাদানে পরিণত হইতে পারিত। এই প্রস্তর স্খলনের মূলেও একই নীতি সর্ব্বদাই বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং ক্রিয়ার সামঞ্জস্য রক্ষা করিতেছে। মানুষ মাত্রেই মানসিক শক্তি ও আত্মচেষ্টার বলে প্রাকৃতিক শক্তিকে নিজ নিজ গতি-পথে পরিবর্ত্তিত করিয়া, নিজ ব্যবহারে বিনিয়োগ করিতে এবং পীড়ক হওয়ার পরিবর্ত্তে উহাকে সেবক ও কৃতদাস-রূপে পরিণত করিতে পারেন। এইরূপেই মানুষ মাধ্যা-কর্ষণ শক্তি (Gravitation), বাষ্প-চালিত শক্তি (Steam), বৈদ্যুতিক শক্তি (Electricity), আরও কত কি আয়ত্ত

করিয়াছে এবং বর্ব্বরতা ও নিষ্ঠুরতা হইতে সভ্যতার সোপানে উন্নীত হইয়াছে। আজ সে জ্ঞানে-প্রজ্ঞানে সম্পূর্ণতা-লাভ-প্রয়াসী। কিন্তু তাহার এই চিকীর্ষার মূলে রহিয়াছে তাহার কোনও নীতির ক্রিয়া সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান-লাভ এবং উত্তরোত্তর জ্ঞান-সঞ্চয়ের ইচ্ছা। আজ মানুষ জীবজন্তু হইতে কত উচ্চে! বর্ব্বর অবস্থায় কিন্তু তাহা-দের মধ্যে পার্থক্য খুব কমই ছিল। মানুষ প্রথমে স্বাভা-বিক শক্তিদ্বারা অন্যের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিতে চেষ্টা করিত। ক্রমে সে এই শক্তির মূলে এক নীতি আবিষ্কার করিয়া ফেলিল। এই জ্ঞানসংবৃত বুদ্ধিই তাহার উন্নতির কারণ—তাহার ব্যুৎপত্তি ও সংস্কারের মূল উপাদান।

অর্থোন্নতি সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য; ইহাও এক প্রয়োগ ও পুষ্টিনীতির দ্বারা (Great law of use and nourishment) পরিচালিত। তবে এই নীতির ক্রিয়া মানুষ এবং জাগতিক অপরাপর বস্তুর পক্ষে বিভিন্নরূপে ব্যক্ত হয়। মানুষের বেলা যাহা চৈতন্য-সংবৃত, রাসায়ণিক, উদ্ভিজ্জ এবং জীবজন্তু-জগতে তাহা একরূপ স্বাভাবিক, প্রবৃত্তির বলে অথবা অজ্ঞাতসারেই সম্পন্ন হয়। Hyd-rogen এবং oxygenএর সমাবেশে জলোৎপাদন আক-র্ষণী শক্তির এক অন্ধ ক্রিয়ার ফল। কিন্তু মানুষ কার্য্য করে

তাহার বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে। বুদ্ধি উপযুক্ত পথে পরিচালিত হইলে, তবেই উহা কার্য্যকরী হয়, নচেৎ নানাবিধ প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি করিয়া থাকে।

আমি কয়েকটি প্রবন্ধে দেখাইতে চাহি যে, অর্থোন্নতির মূলে সনাতন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এক মহান নীতি বর্ত্তমান। তৎপরে কিরূপে এই নীতিকে আয়ত্ব করা যায় এবং কিরূপেই বা উহা কার্য্যকরী হয়, তাহার পন্থা নির্দ্দেশ করা আবশ্যক। তৃতীয়তঃ, কতিপয় কৃতকর্ম্মা ব্যক্তির কার্য্যক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়া প্রমাণ করিব যে, যে-কেহ যে-কোনও বিষয়ে কৃতকার্য্য হউন না কেন, তিনি জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতসারে তাঁহার নিজ ব্যবসায়ে উক্ত বিষয়ক নীতির অনুসরণ করিয়াছেন।

আমরা সর্ব্ববিষয়ে সুফলের আশা করি; কিন্তু সাংসারিক লোকের পক্ষে অর্থের স্বচ্ছলতা ব্যতীত উহা কখনই সম্ভব নহে। আমরা মনে মনে কত কি কল্পনা সৃজন করিয়া থাকি, কত সদিচ্ছা পোষণ করি, কিন্তু অর্থের অনটনে সকলই শূন্যে গৃহ-নির্ম্মাণের ন্যায় বিফল হইয়া যায়। সুতরাং অর্থোপার্জ্জনের কার্য্যকরী পন্থা ও মৌলিক নীতিগুলি আমাদিগকে নির্ণয় করিতেই হইবে। আমি কিয়ৎপরিমাণে এই সমস্যার সমাধান করিতে প্রয়াস পাইয়াছি।

আমার একান্ত বিশ্বাস যে, এই পুস্তক পাঠে দেশের যুবকবৃন্দ অথবা অন্যান্য যাঁহারা বেকার বসিয়া আছেন তাঁহারা এবং যাঁহারা ব্যবসা-কার্য্যে লিপ্ত, সকলেই বহুল পরিমাণে উপকৃত হইবেন। কার্য্যক্ষেত্রে আমার এই বহু বৎসর-ব্যাপী অভিজ্ঞতা তাঁহাদিগকে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে যথেষ্ট সাহায্য করিবে। কিন্তু তাহাদিগকে এই কথা সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে,

"উদ্যোগীং পুরুষ-সিংহমুপৈতি লক্ষ্মী"।

বর্ত্তমান যুগের সুপ্রসিদ্ধ কর্ম্মবীর Henry Fordও বলিয়াছেন—

The natural thing to do is to work—to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest efforts. Human ills flow largely from attempting to escape this natural course, I have no suggestion which goes beyond accepting in its fullest this principle of nature. I take it for granted that we must work. All that we have done comes as the result of a certain insistence that since we must

work, it is better to work intelligently and forehandedly, that the better we do our work, the better off we shall be. All of which I conceive to be merely elemental common sense.

প্রথম অধ্যায়

অর্থ

পণ্যের আদান-প্রদান কিম্বা শ্রমমূল্য (Value of services) নির্দ্ধারণ করিতে হইলে অর্থের প্রয়োজন। এমন এক সময় ছিল, যখন শুধু দ্রব্য-বিনিময়ে সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ হইত। তখন একই লোক বহুবিধ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া, নিজের অভাব পূরণ করিবার জন্য চেষ্টা করিত। কিন্তু ইহাতে দেখা যায়, তাহার কার্য্যকরী শক্তির কিয়ৎ-পরিমাণ অপব্যয় হয়। তাহার কারণ দুই প্রকার। প্রথমতঃ একই লোক সকল কার্য্যে সমান পারদর্শী নহে ; দ্বিতীয়তঃ, কার্য্য হইতে কার্য্যান্তর গ্রহণের মধ্যে যে অবসরসময়টুকু থাকে, তাহা বৃথা ব্যয়িত হয়। অধিকন্তু তাহার অন্য এক প্রকার ক্ষতির প্রমাণ পাওয়া যায়। তাহা এইরূপে আমরা জানি যে, কোন ব্যক্তি কোনও একটি বিশেষ কার্য্যে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিলে ঐ কার্য্যে তাহার পারদর্শিতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু প্রতিনিয়ত কার্য্যান্তর গ্রহণের ফলে উহা বহু পরিমাণে বাধা পায়। সমাজের এই অবস্থায়

অনেক সময় বিনিময়ে পণ্যের আদান-প্রদান হইত। কারণ একই ব্যক্তি তাহার সমস্ত সদিচ্ছা সত্ত্বেও সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে না।

সমাজের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন সময়ে বিনিময় সাহায্য-কল্পে বিভিন্ন দ্রব্য ব্যবহৃত হইয়াছে। আমাদের দেশে এক সময় কড়ির প্রচলন ছিল। কোনও কোনও স্থানে আবার গৃহ পালিত পশু কিংবা উহাদের চর্ম্মের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। কিন্তু ইহাদের কোনটিই বেশী দিন স্থায়ী হইল না। শেষে ধাতু দ্রব্য আবিষ্কৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উহাই বিনিময়-মূল্যরূপে গণ্য হইল। প্রথমতঃ লোক আকৃষ্ট হইল উহার ঔজ্জ্বল্য দেখিয়া। আদিম যুগের মানুষ নিজের শ্রেষ্ঠতার নিদর্শন স্বরূপ সর্ব্বপ্রকার ধাতু-দ্রব্যই অলঙ্কাররূপে ব্যবহার করিত। তৎপরে দেখা গেল যে, সাধারণ পণ্যদ্রব্যের তুলনায় ইহার আরও কতকগুলি বিশিষ্ট গুণ আছে ; যথা—

১। ইহার দীর্ঘস্থায়িত্ব।

২। ইহাকে ইচ্ছানুরূপ অংশে বিভক্ত করা যায়।

৩। ইহার বিভক্ত অংশগুলি সমগুণসম্পন্ন।

৪। অল্পায়তন ইহা বহুমূল্যতার নিদর্শন স্বরূপ।

৫। ধাতু পরিমাণ কোন এক ব্যক্তির প্রয়োজন

অনুযায়ী স্থান হইতে স্থানান্তরে লইতে বিশেষ অসুবিধা নাই।

এই সকল কারণে লৌহ, রৌপ্য, স্বর্ণ এবং অন্যান্য প্রায় সর্ব্বপ্রকার ধাতুই কোন-না-কোন সময়ে মুদ্রা রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। যাহা হউক, এই উদ্দেশ্যে শেষ পর্য্যন্ত স্বর্ণই প্রধান স্থান পাইয়াছে, তৎপর রৌপ্য এবং পর্য্যায় ক্রমে অপরাপর কয়েকটি ধাতু।

মুদ্রার মূল্য বলিতে আমরা বুঝি উহার দ্রব্যমূল্য নির্দ্ধারণ-ক্ষমতা। এই ক্ষমতা সকল সময় এক থাকে না। ধাতুদ্রব্য মুদ্রা ভিন্ন নানাবিধ শিল্পেরও উপাদান। ইহার এই উভয়বিধ ব্যবহারের জন্য মুদ্রার মূল্য সময় সময় হ্রাস ও বৃদ্ধি পায়; আবার শিল্পেও ব্যবহৃত ধাতুর মূল্য সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি ও হ্রাস পায়। মুদ্রার মূল্য আরও একপ্রকারে পরিবর্ত্তিত হয়। টাকার মূল্য বুঝিতে আমরা বুঝি ১৲ টাকায় যত জিনিষ পাওয়া যায়। পূর্ব্বে যখন টাকা ছিল না, তখন দ্রব্য মূল্য নির্দ্ধারিত হইত উহাদের পরস্পর বিনিময়-হার দৃষ্টে! এই সময় বিভিন্ন পণ্যের মূল্য তুলনা করা দুষ্কর ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে টাকা বস্তুর সাধারণ মূল্য-পরিমাপক বলিয়া গণ্য হওয়ায়, এই বিষয় বহুপরিমাণে সুসাধ্য হইয়াছে।

অর্থ দ্রব্য-বিনিময়-সহায়ক। শুধু তাহাই নহে, উহা শ্রম বিনিময়েরও সহায়তা করিয়া থাকে। বর্ত্তমান যুগে অর্থের দ্বিতীয়োক্ত ব্যবহারই সমধিক উল্লেখযোগ্য। এখন মানুষ প্রাচীন যুগের সরল সংসার-যাত্রা পরিত্যাগ করিয়া, দিনের পর দিন নিজের অভাব-বৃদ্ধি ও তাহা পূরণ করিবার পন্থা নির্দ্ধারণ করিতে ব্যস্ত। তাহার এই দুর্ণিবার ক্ষুধা, এই ভোগ-সুখ-লালসা কখনও পরিতৃপ্ত হইবে কি না বলা যায় না। যাহা হউক, অন্ততঃ বস্তু-জগতে অর্থ বাস্তবিকই মানুষকে তাহার ঈপ্সিত দ্রব্য লাভে বহুল পরিমাণে সহায়তা করিতেছে।

বর্ত্তমান জগতে রাসায়নিক তথা যান্ত্রিক এবং অন্যান্য যত কিছু শিল্পোন্নতি আমরা দেখিতে পাই, সকলই অর্থ সাহায্যে সম্ভব হইয়াছে। কল-কারখানায় মজুর দিনের পর দিন একই কাজ নিশ্চিন্ত মনে করিয়া যায়। এইরূপ যন্ত্রের মত কাজ করা তাহার আদৌ সুখপ্রদ নহে; তথাপি সে উহা হইতে বিরত হয় না, কারণ সে জানে যে, কার্য্যান্তে অর্জ্জিত অর্থ দ্বারা সে গ্রাসাচ্ছাদন প্রভৃতির যাবতীয় সামগ্রী সাধ্যমত ক্রয় করিয়া নিজের অভাব পূরণ করিতে সমর্থ হইবে। অন্যান্য শ্রমিকেরও এইরূপ মনোবৃত্তি। ইহা না হইলে, কৃষি ও

শিল্পের বহুপ্রজননতা (large scale production) কখনও সম্ভবপর হইত না ; কারণ এতৎকল্পে দ্রব্য-উৎপাদনের প্রথম স্তর হইতে শেষ পর্য্যন্ত ব্যবসায়ী ও শ্রমিককে অনেকদিন অপেক্ষা করিতে হইত। ইতোমধ্যে ব্যবসায়ীর অর্থ শ্রমিকের গ্রাসাচ্ছাদন এবং অন্যান্য অভাব পূরণ করিবার ব্যবস্থা করিয়া থাকে।

যাহা হউক, আসলে অর্থ বিনিময়-মান, সাধারণের এই ধারণা নাই বলিয়াই আমরা দেখিতে পাই যে, তাহাদের মধ্যে একদল লোক সর্ব্বদা উন্মত্তের মত অর্থের অনুসরণ করিতেছেন ; তাঁহারা মনে করেন অর্থ অর্থের জন্যই। অর্থ-দেবতার কাছে তাঁহারা সকল সুখ-শান্তি-স্নেহ-মমতা প্রভৃতি বলি দিয়া শুধু অর্থান্বেষণই করিয়া থাকেন। আবার অন্য পক্ষে দেখিতে পাই যে, এক দল লোক "অর্থই অনর্থের মূল" বলিয়া চিৎকার করিতেছেন, সর্ব্ব প্রকার ব্যবসা দ্বারা অর্থোপার্জ্জন তাঁহাদের কাছে নিন্দনীয়। ইহারা উভয়েই ভ্রান্ত, উভয়ের যুক্তিই অতিশয়োক্তিদোষে দুষ্ট। যিনি অর্থকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করেন, তিনি বাস্তবকে আদর্শ বলিয়া ভুল করেন। পরন্তু যিনি অর্থান্বেষণ বা উহার ইচ্ছাকে পর্য্যন্ত ঘৃণা করেন, তিনিও নিজে প্রতারিত হন। কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট অর্থ দেবতা

কিংবা শয়তান কিছুই নহে। তিনি জানেন, জগতে এই অর্থ-সাহায্যে অনেক দুষ্কর কার্য্য সম্পন্ন করা সহজ। অপরের নিকট হইতে ভিক্ষা বা দান ব্যতীত সৎভাবে জীবনযাত্রা করিতে হইলেই অর্থের প্রয়োজন। সুতরাং নিজ অভাব মোচনের পরও তাঁহার একটু স্বচ্ছলতা আবশ্যক; কারণ ভবিষ্যতের জন্য কিছু সঞ্চয় করিয়া না রাখিলে, সময় সময় এমন অনেক অদৃষ্টপূর্ব্ব ঘটনা ঘটে, যখন অর্থের খুবই প্রয়োজন হয়। এইজন্য তিনি অর্থের আদর করিয়া থাকেন। তিনি সম্যকরূপে অবগত আছেন যে, অর্থ মানুষের মনে বহুবিধ লালসা, লোভ এবং দুষ্প্রবৃত্তির সৃষ্টি করিয়া থাকে সত্য; তথাপি প্রয়োজনানুযায়ী অর্থ না থাকিলে জীবন একরূপ দুর্ব্বিষহ হইয়া উঠে। অর্থহীন লোকের সমস্ত গুণাবলী নষ্ট হইয়া যায়, সত্য সত্যই "দারিদ্র্য, দোষো গুণরাশিনাশীঃ"। অর্থের অভাবে মানুষ বহু মহৎ কার্য্য সম্পাদনে অসমর্থ, অন্তরের বাসনা ও সৎ প্রবৃত্তি একবার জাগ্রত হইয়া অন্তরেই লয়প্রাপ্ত হয়!

অর্থ উপার্জ্জন করিবার স্বাভাবিক ইচ্ছার অভাব ও তৎ-পশ্চাৎ অন্বেষণ মানুষকে জীবন-ধারণের যোগ্যতা-বিহীন একটি অপদার্থ করিয়া ফেলে। জ্ঞানী ব্যক্তির 'অর্থের আকাঙ্ক্ষা' অর্থে বুঝিতে হইবে, টাকার দ্বারা যাহা ক্রয়

করা যায়, এমন বহুবিধ দ্রব্যাদি তিনি পাইতে ইচ্ছা করেন। অর্থ মানুষের সর্ব্বপ্রকার সুখ-স্বচ্ছন্দতার আদর্শ এবং সমস্ত সুবিধা ও উন্নতির রাস্তা বাহির করে; ইহার অভাবে মানুষ কিছুই সম্পাদন করিতে পারে না। অর্থই যন্ত্র, যাহার দ্বারা মানুষ বহু সুন্দর জিনিষ কাটিয়া বাহির করিতে পারে, বহু মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিতে পারে। ইহার সাহায্য ব্যতিরেকে সে সম্পূর্ণ অসহায়।

আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, অর্থের একসময় কোন প্রচলন ছিল না। তখন পণ্যের আদান-প্রদান ছিল, তাহাতে অনেক অসুবিধা হইত। আবার এমনও এক সময় আসিতে পারে, যখন মুদ্র -ব্যবস্থার আদৌ প্রয়োজন থাকিবে না। কিন্তু এই বিংশ শতাব্দীতে, সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায়, মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য অর্থ বিশেষ প্রয়োজনীয়। যিনি অর্থোপার্জ্জনে নিশ্চেষ্ট থাকেন, বাঞ্ছিত বস্তু লাভের আশা তাঁহার পক্ষে নিতান্ত অসমীচীন। যদি কোন ব্যক্তি অর্থোপার্জ্জনে অসমর্থ হন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে ভালরূপ আহার, বিহার, পোষাক, পরিচ্ছদ, গৃহ, বিদ্যালাভ প্রভৃতি আধুনিক সভ্য সমাজের উপযুক্ত যাহা কিছু সকলই দুষ্প্রাপ্য।

অর্থোপার্জ্জনে যাঁহারা অবজ্ঞা প্রকাশ করেন, তাঁহারা সাধারণতঃ দুই শ্রেণীভুক্ত। প্রথমতঃ দেখা যায় একপ্রকার লোক—যাঁহাদের অর্থোপার্জ্জনে মনোযোগ দেওয়ার মত গুণাবলীর নিতান্তই অভাব। আবার আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা উত্তরাধিকার-সূত্রে এবং বিনা পরিশ্রমে বিপুল বিত্তের অধিকারী; তাঁহাদের মনে স্বকৃত উপার্জ্জন-জনিত কোনরূপ সম্ভোগের বাসনা থাকিতে পারে না। প্রথম শ্রেণীর লোকের অর্থোপার্জ্জনে ক্ষমতা ও চেষ্টা না থাকায় গল্পোক্ত দ্রাক্ষালাভেচ্ছু শৃগালের মতই অর্থকে তাঁহারা তিক্তস্বাদ বলিয়া ত্যাগ করিতে বাধ্য হন; তাঁহাদের এইরূপ আচরণ অযোগ্যতার পরিচায়ক মাত্র। আবার অর্থের প্রাচুর্য্যবশতঃ দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকের উপার্জ্জন-চেষ্টা আদৌ থাকে না। অজীর্ণ রোগ-গ্রস্ত ব্যক্তির আহারে অরুচির মতই তাঁহারা স্বভাবতঃ অর্থোন্নতি-রূপ ক্ষুধা-বিরহিত।

বহু ধর্ম্মসংস্কারকদিগের চিৎকার ও নির্ব্বন্ধ প্রতিবাদ স্বত্বেও অর্থের প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না; কারণ আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় যাহা কিছু আমরা এই অর্থ সাহায্যেই পাইতে পারি। কেবল সুন্দর কল্পনা লইয়াই বাঁচিয়া থাকা যায় না। ভাত, কাপড়, আহার, বিহার, লোক-

লৌকিকতা, সমাজে থাকিতে হইলে যাহা কিছু আবশ্যকীয় সকলই আমরা চাই। কিন্তু টাকা না হইলে, ঐ সকল কেমন করিয়া পাওয়া যায়? 'অর্থ' মানে জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য, স্বাধীনতা, ক্ষমতা, অধিকার, মুক্তি এবং বহু মহৎ কার্য্য; আবার অন্যায় করিবারও শক্তি বটে। অর্থের সাহায্যে আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করা যায়। অর্থ মানসিক অভিপ্রায় পূর্ণ করে—অতিমাত্র আনন্দের সময়ে শূন্যে-গড়া কল্পনাকে মূর্ত্ত করিয়া তোলে। বাস্তবিক অর্থরূপী যাদুকর প্রায় সকল কার্য্যই সম্পাদন করিতে সমর্থ।

উদ্ভিদের পক্ষে বায়ু, জল, রৌদ্রতাপ এবং পৃথিবীর মাটী যেরূপ প্রয়োজনীয়, মানুষের পক্ষে অর্থও ঠিক সেইরূপ। অর্থ মানুষের বৃদ্ধি ও পুষ্টির উপাদান। আবার উদ্ভিদের পুষ্টিলাভ করার প্রবৃত্তি যেমন স্বভাব-সঞ্জাত, মানুষের পক্ষে আর্থিক পুষ্টির ইচ্ছাও ঠিক তদ্রূপ। ইহা এক স্বাভাবিক নীতির (Natural Law) কার্য্য। উদ্ভিদের পুষ্টি-লাভের ইচ্ছা ও আবশ্যকতার প্রমাণ পাওয়া যায় তাহার বাহ্যিক বৃদ্ধি-প্রকাশে! তদ্রূপ মানুষের প্রাণের ইচ্ছা, তাহার সন্তোষ ও প্রাপ্তির সম্ভাবনা তাহার অর্থের প্রয়োজনীয়তার একটি বিশেষ লক্ষণ। প্রকৃতি পরিহাসকারিনী নহে। ইহা কোনও জীবন্ত পদার্থের উপর ফুটিয়া উঠিতে

কখনও চেষ্টা করে না, যদি ঐ জীবন্ত পদার্থের যাহা অভিলাষ, তাহা পাইবার শক্তি ও দক্ষতা তাহাতে সংযুক্ত না থাকে।

আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, স্বভাব (Nature) যখন কোন জিনিষ অর্জ্জন করিতে আমাদিগকে উৎসাহিত করে, উহা শুধু সঞ্চয় করিবার জন্য নহে—ব্যবহারের জন্য! এই ভুলের জন্য আমাদিগকে ভীষণ শাস্তি পাইতে হয়। ব্যবহার-নীতির (Law of use) মূলে স্বভাবের সহজ অভিলাষ নিহিত রহিয়াছে। সমস্ত জীবন্ত পদার্থ তাহাদের পুষ্টির উপযুক্ত উপাদান তাহা হইতে ব্যবহারের জন্য আকর্ষণ করিয়া লয়। মানুষের মধ্যেও অর্থের আকাঙ্ক্ষা একই নীতির দ্বারা পরিচালিত। অর্থের উপযুক্ত ব্যবহার দ্বারা মানুষ ব্যবহার-নীতির গণ্ডির মধ্যে আসিয়া পড়ে এবং স্বাভাবিক শক্তি ও উদ্দেশ্যের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া কাজ করে। তখন সে নিজেকে বিশ্বের আদর্শের সহিত ঐক্যবদ্ধ করিতে নানারূপ সংঘর্ষ হ্রাস করিয়া, লক্ষ্য-স্থানে পৌঁছিতে সমর্থ হয়।

কখনও ভীত হইও না। অর্থোপার্জ্জনের ইচ্ছা বলবতী কর। মনে রাখিবে, অর্থ হস্তগত করা তোমার স্বাভাবিক অধিকার, যেমন উদ্ভিদের স্বাভাবিক অধিকার

সূর্য্যের তাপ, আলো ও বাতাস পাওয়া। স্বভাব-নীতির নিকট দাবী কর, যেমন উদ্ভিদ করিয়া থাকে।

দরিদ্র ব্যক্তি সুখে আছে এবং "দারিদ্রতা সুখ—ঐরূপ উক্তি নির্ব্বুদ্ধিতা ও অলসতার পরিচায়ক। তুমি জান, তোমার অন্তরে এই কথা স্থান পায় না। এই কুটিলতা ও আত্মপ্রবঞ্চনার মুখোস টানিয়া ফেলিয়া দাও; মানুষের মত মস্তক উন্নত এবং মন স্থির করিয়া, সরল চিত্তে এবং স্পষ্ট ভাষায় বল "অর্থ আমি চাই-ই! আমার অর্থের নিতান্ত প্রয়োজন। অর্থোপার্জ্জন আমার স্বাভাবিক অধিকার! আমি উহা নিশ্চয়ই লাভ করিব!"

ক্রীতদাসের শৃঙ্খল দূরে নিক্ষেপ করিয়া, তোমার জন্মগত জাতিগত অধিকার—অর্থের স্বাধীনতা দাবী কর। যাহা তোমার, তাহার উপর তোমার প্রভুত্ব কায়েম্ কর—তোমার সম্মুখে তাহা পড়িয়া রহিয়াছে। মানসিক চাঞ্চল্য ও দুর্ব্বলতা বর্জ্জন করিয়া, নিজ লক্ষ্য স্থির রাখিয়া গন্তব্য-পথে অগ্রসর হও; এই পথে কেবল তোমার বাসনাকে অচঞ্চল এবং অন্তরের ইচ্ছাকে সংহত করিয়া চল। অর্থাগম তোমার নিশ্চিত!

দ্বিতীয় অধ্যায়

মনোবৃত্তি-গঠন

শাস্ত্রকার লিখিয়াছেন, "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধি-র্ভবতি তাদৃশী"। ইহার মর্ম্ম এই যে, মানুষ নিজ নিজ ভাবনা অনুযায়ী কর্ম্মে সফলতা লাভ করে। এই বাক্যের সারবত্তা ও তাৎপর্য্য আমরা জীবনের সর্ব্বাবস্থায়ই উপলব্ধি করিয়া থাকি। বাস্তবিক মানুষ যেরূপ ভাবিতে শেখে, সেইরূপ ভাবেই তাহার জীবন গঠিত হয়। আমাদের কর্ম্ম ও চিন্তা পরস্পর আশ্রিত। আমাদের বর্ত্তমান জীবন আমাদের গতজীবনের চিন্তা-প্রসূত ফল। এক কথায় বলিতে গেলে, মানুষের মনোবৃত্তিই তাহার জীবনের উন্নতি কিংবা অবনতির পথ-নির্দ্দেশ করিয়া দেয়।

এই মনোবৃত্তির মূলে রহিয়াছে মানবের চিন্তাধারা, ধ্যান-ধারণা, অনুভূতি এবং তাহার বিকাশ। ফলে হয় লোকের চরিত্র গঠন ; শুধু নিজের নয়, অপরের জীবনেও ইহার সংঘাত পরিলক্ষিত হয়। শুভ কিংবা অশুভ ফলের জন্যই হউক, একের চিন্তা পারিপার্শ্বিক অন্যান্য

প্রায় সকলের উপর প্রতিফলিত হইয়া, মানুষকে তাহার নিজ নিজ গুণানুযায়ী প্রভাবান্বিত করে। সুতরাং যাহাতে এই মনোবৃত্তি গঠন, তদুপযোগী উপাদান আদর্শ ও যন্ত্র সাহায্যে হইতে পারে, সে বিষয়ে আমাদের সবিশেষ যত্নবান হওয়া উচিত।

মানুষ যে কৃতনিশ্চয় মনোবৃত্তির (positive mentality) সাহায্যে জীবনে আর্থিক উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হয়, ইহাই এই অধ্যায়ের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়। আলোচনার প্রারম্ভেই এই প্রকার মানসিক কৃতনিশ্চয়তা এবং ইহার বিপরীত মনোবৃত্তির (negative mentality) একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। তৎপরে আমরা প্রমাণ করিব যে, এতদুভয় মনোবৃত্তির মধ্যে পূর্ব্বোক্ত মনোবৃত্তির সাহায্যে সকল বিষয়ে সৌকর্য্য ও সফলতা লাভ করা যায়; এবং পরবর্ত্তী মনোবৃত্তি শুধু দুঃখ, দৈন্য ও নিস্ফলতাই আনায়ন করে। কৃতনিশ্চয় মনোবৃত্তি বলিতে আমি বুঝি, মনের আশ্বস্তভাব, আত্মপ্রত্যয়, নির্ভীকতা, উদ্যম, কর্ম্মপ্রচেষ্টা, সর্ব্ববিষয়ে শুভফল এবং ঐশ্বর্য্য-লাভের আশা, মন হইতে দারিদ্র্য ও দুশ্চিন্তার অপসারণ, অর্থাৎ এক কথায় বলিতে গেলে, আত্মনির্ভরতার সহিত প্রকৃতির মহান্ দুর্লঙ্ঘ্যনীতি

(Great Law of nature) মানিয়া চলা। ইহার বিপরীত মনোবৃত্তি মানবহৃদয়ে ক্লেশ ও ভীতির সঞ্চার করিয়া নানা-রূপ দুঃখ ও দুর্দ্দৈবের সংঘটন করিয়া থাকে। ফলে হয় এই যে, তাহাদের না থাকে নিজের কার্য্যক্ষমতায় বিশ্বাস, না থাকে তাহাদের নীতি ও নিয়মানুসরণে সবিশেষ প্রবৃত্তি।

প্রথমতঃ, আমাদের চিন্তা আমাদিগকে কার্য্যসিদ্ধি-সহায়ক গুণ-সম্পন্ন করিয়া কৃতকার্য্যতার পথে অগ্রসর করিয়া দেয়। পৃথিবীতে এমন অনেক লোক আছেন, যাহাদের মুখে শুনি সর্ব্বদা দুঃখ ও নিরাশার বাণী; তাঁহা-দের বিশেষ অনুযোগ তাহাদের দুর্ভাগ্য। তাঁহারা মনে করেন যে, উপযুক্ত সুযোগ, সুবিধা, শিক্ষা ও দীক্ষার অভাবে এবং অপরে যে সকল গুণাবলীর সাহায্যে ও মানসিক প্রকৃতির বলে জীবনে সফলকাম হইয়াছেন, সেই সকল গুণ না থাকায়, তাঁহারা জীবন ভরিয়া শুধু বিফলতাই লাভ করিয়াছেন; নচেৎ তাঁহাদের জীবনের ইতিহাস অন্যরূপ হইত। তাঁহাদের এইরূপ উক্তি কথঞ্চিৎ যুক্তিযুক্ত বটে। কিন্তু এই যুক্তির নিরসন আবার তাঁহারাই করিয়া থাকেন, যখন তাঁহারা মনে করেন যে, এই সকল গুণের সহিত ব্যক্তি বিশেষের জন্মগত

সম্বন্ধ আছে এবং শত চেষ্টা সত্ত্বেও মানুষ তাহার প্রকৃতির পরিবর্ত্তন করিতে পারে না। মন সম্বন্ধে তাঁহাদের ধারণা এই যে, ইহা একটি স্থানুর ন্যায় অচল পদার্থ—ইহার আয়তন, পরিধি এবং গঠনোপযোগী উপাদান সকলই সীমাবদ্ধ, এবং চিরকালের জন্য নির্দ্দিষ্ট। ইহার কোনরূপ উৎকর্ষ-সাধন একেবারেই অসম্ভব। মনের প্রগতি সম্বন্ধে এই-যে তাঁহাদের ভ্রান্ত ধারণা ও সংস্কারের বাঁধা গৎ, ইহাই তাঁহাদের বিফলতার মূলীভূত কারণ।

বস্তুতঃ মানুষ সাধনার বলে, নিজ নিজ চরিত্র, প্রকৃতি ও অভ্যাসের আমূল পরিবর্ত্তন করিতে পারে। এই প্রকার শিক্ষা বিজ্ঞান-সম্মত। চরিত্রের দূষণীয় ভাবগুলি বিতাড়িত করিয়া, স্বকীয় চেষ্টা-বলে সে বাঞ্ছিত গুণাবলী, বৈশিষ্ট্য ও সর্ব্ববিষয়ে দক্ষতালাভে সমর্থ হয়। মস্তিষ্ক মনের যন্ত্র-স্বরূপ, এই যন্ত্র সাহায্যেই মানসিক বৃত্তির প্রকাশ। এই মস্তিষ্ক আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য চিন্তা-কোষ সমন্বয়ে গঠিত! ইহাদের অতি অল্প সংখ্যকই বাস্তবিক পক্ষে কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। এইরূপ জানা যায় যে, মানুষ কোনও বিষয়ে মনঃসংযোগ করিলে, মস্তিষ্কের যে অংশ হইতে ঐ বিষয়-সংশ্লিষ্ট-চিন্তা উদ্ভূত হয়, তদ্দেশ-সংলগ্ন অব্যবহৃত চিন্তা-কোষগুলি ও উদ্রিক্ত হইয়া আপনা-

দিগকে কার্য্যে ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করে। শুধু তাহাই নহে, অতঃপর উহারা প্রজনন-ক্ষমতা প্রাপ্ত হয় এবং অধিকতর চিন্তা-কোষ সৃষ্টির সাহায্য করিয়া থাকে। এই রূপে অভিব্যক্তির জন্য উন্মুখ নব নব ভাব, গুণাবলী এবং অনুভূতির প্রকাশ-যন্ত্র নির্ম্মিত হয়।

বৈজ্ঞানিক উপায়ে চরিত্রগঠন অলস-মস্তিষ্ক-প্রসূত কল্পনা নহে। ইহা একটি বাস্তব ও জীবন্ত সত্য। সর্ব্ব-দেশে মনের রাসায়ণাগারে এই পরীক্ষা চলিতেছে, এবং পৃথিবীব্যাপী অসংখ্য লোক এই প্রক্রিয়ার ফলে, কার্য্যে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন এবং করিতেছেন। আবার কার্য্য ও চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে তাহার মস্তিষ্কে ওই কার্য্যসিদ্ধির উপযোগী চিন্তাকোষগুলি সৃষ্ট হইতেছে। এই মহান্ সত্য উপলব্ধি করিতে পারিলে, তুমিও সফলতা লাভ করিতে সমর্থ হইবে।

প্রবন্ধের বর্ত্তমান অংশে বিচার্য্য এই যে, কিরূপে একের মানসিক চিন্তা অর্থোন্নতি-ব্যাপারে অন্যের মনকে প্রভাবান্বিত করে। ইহাই ছিল আমাদের বিষয়-অবতারণার দ্বিতীয় পর্ব্ব। একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারি যে, আমরা সর্ব্বদাই অপর সকলকে আমা-দের গুণ ও কার্য্যক্ষমতা সম্বন্ধে একটা আভাষ দিয়া

আসিতেছি। যদি আমরা নিরুৎসাহ, ভীতি, এবং নিজের ক্ষমতায় অবিশ্বাস, মনের এই সকল ঋণাত্মক (negative) ভাব লইয়া অপরের সংস্পর্শে আসি, তবে আমরা অতি সহজেই অনুমান করিতে পারিব যে, তাহারা আমাদের ভাবনানুযায়ী আমাদের প্রতি আচরণ করিতেছে।

যদি কোন ব্যক্তি তাহার পণ্য-সম্ভার লইয়া, দ্বিধাযুক্ত চিত্তে তোমার নিকট উপস্থিত হয় এবং ব্যবসায় করিবার অভিলাষ প্রকাশ করে, তাহা হইলে তোমার মধ্যে স্বতঃই একটা মানসিক দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইবে। ফলে হয়ত তুমি তাহার সহিত ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইবে না। এইরূপে স্বকৃত দোষের জন্য তাহার ক্ষতিগ্রস্ত হইবারই সম্ভাবনা। কিন্তু যদি সে মানসিক উৎসাহে ও মনোরথ-সিদ্ধির সম্পূর্ণ ভরসা লইয়া তোমার নিকট ঐ বিষয় প্রস্তাব করিত, তাহাহইলে তুমিও তাহার সফলতার বাণী শ্রবণে তাহার উপর নির্ভরশীল হইতে এবং দ্রব্যাদি পরীক্ষা করিয়া সম্ভবতঃ তাহার সহিত ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতে।

এমন অনেক লোক দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা বিফলতা, নিরুৎসাহ এবং "আমি পারিব না" এইরূপ মনোবৃত্তি লইয়াই জগতে বিচরণ করিতেছেন। তাঁহাদের এই আন্তরিক নৈরাশ্য অপর সকলের মনেও অলক্ষ্যে

প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। পরন্তু এমন লোকও আছেন, যাঁহাদের সান্নিধ্য লাভ করিলে, মন আপনা হইতেই উৎফুল্ল হইয়া উঠে ; ভয়, ভাবনা দূরে পলায়ন করে, হৃদয়ে উৎসাহ ও নবোদ্যমের উদ্রেক হয়। আমার ধারণা (একরূপ স্থির সিদ্ধান্ত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না) এই যে, এবম্বিধ উভয় প্রকার লোকের চতুষ্পাশে আকর্ষণী ও বিকর্ষণী শক্তির এক-একটি মণ্ডল গঠিত হয়। এই মণ্ডল-গঠনের মূল উপাদান মানবের চিন্তা-ধারা অথবা জীবন-যুদ্ধে তাহাদের প্রাত্যহিক মনোগত ভাব। ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, মনোরাজ্যেও প্রকৃতির এক দুর্লঙ্ঘ্য নীতি সাধিত হইতেছে।

তৃতীয়তঃ এই মানসিক আকর্ষণী-শক্তি কিরূপে আর্থিক উন্নতির পথ সুগম করিয়া দেয়, তাহাই বিবেচ্য। কোনও উৎকট মতবাদের অবতারণা না করিয়া, আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, মনোজগতেও সমগুণাত্মক ভাবসমূহের পরস্পর আকর্ষণ অবশ্যম্ভাবী ; অথবা এইরূপ বলা যাইতে পারে যে, একের মনোবৃত্তি তাহার সহিত ঐক্যসংবদ্ধ অন্যান্য সকল বস্তু, পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং সমস্ত সমগুণী লোককে চুম্বকের ন্যায় আকর্ষণ করিয়া থাকে।

যদি আমরা সফলতা-লাভে কৃতসঙ্কল্প হই এবং ঐ

ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া জীবন-সংগ্রামে অগ্রসর হইতে থাকি, তাহা হইলে আমাদের মনোবৃত্তি এমন ভাবে গঠিত হইবে যে, কৃতকার্য্যতা ও কার্য্যসিদ্ধি-সহায়ক যাহা কিছু, তাহাই আমাদের করায়ত্ত হইবে। যদি অর্থোপার্জ্জন আমাদের আদর্শ হয়, তাহা হইলে আমাদের মনোবৃত্তিও ক্রমে ঐ আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া আমাদিগকে উন্নতি-লাভে সহায়তা করিবে। অতঃপর ধনাগমের উপযোগী যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা এবং লোক-সাহায্য কিছুরই অভাব হইবে না। এক কথায় অর্থকরী সকল বস্তুই আমাদের প্রতি আকৃষ্ট হইবে।

অনেকে হয়ত আমার এইরূপ উক্তি নিতান্ত বাতুলের প্রলাপ বলিয়াই মনে করিবেন। তাঁহাদের কাছে আমার বক্তব্য এই যে, তাঁহারা কি কখনও ভাবিয়া দেখিয়াছেন যে, জগতের প্রায় সকল উন্নতিশীল ও ভাগ্যবান ব্যক্তিরই অর্থোপার্জ্জন-চেষ্টার প্রারম্ভ হইতে অর্থ-প্রাপ্তির শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাদের সমস্ত মনপ্রাণ ভরিয়া ছিল একটা দুর্নিবার আশা ও বিপুল ভরসার ভাব ?

লক্ষ্য ভাল কিংবা মন্দই হউক, তোমার আশা এবং মানসিক চিন্তা অনুযায়ী পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু তোমাকে আকর্ষণ করিবে এবং তুমিও নিজে তাহাদের প্রতি আকৃষ্ট

হইবে। ইহাই প্রকৃতির নিয়ম, কোনরূপ কুসংস্কার নহে, পরন্তু বিজ্ঞানসম্মত তত্ত্ব-বিশেষ।

"সমগুণাত্মক বস্তুর পরস্পর আকর্ষণ," "সমব্যবসায়ীর সম্মিলন", এই সকল নীতি সম্বন্ধে মনস্তত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ অনেক গবেষণা করিয়া, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, বায়ুমণ্ডলে বায়ু-প্রবাহের ন্যায় এবং সাগরের জল-তরঙ্গের ন্যায় মনোজগতে বহুবিধ চিন্তা-প্রবাহ বিদ্যমান। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাঁহারা বলেন যে, দোষ, গুণ ভীতি, সাহস, ঘৃণা, ভালবাসা, দারিদ্র্য ও ঐশ্বর্য্য এতদসম্বন্ধীয় সকল প্রকার চিন্তারই এক একটি প্রবাহ আছে। বলাবাহুল্য, যে ব্যক্তি সর্ব্বদাই দারিদ্র্যের বিষয় চিন্তা করে, সে জাগতিক যাবতীয় দারিদ্য চিন্তার ঘূর্ণীপাকে পড়িয়া, তাহারই মত লোকের প্রতি আকৃষ্ট হয়। পক্ষান্তরে অর্থোপার্জ্জনে সচেষ্ট ও কৃতনিশ্চয় ব্যক্তি তাহার সহমতাবলম্বীর সঙ্গলাভ করিয়া থাকে। অতঃপর তাহারা যথাসময়ে পরস্পরের সৌভাগ্য-সুখ সন্দর্শনে সুখী হয়। আমি এই মতবাদের কোনরূপ সমর্থন কিংবা নিরাকরণ করিতে চাহি না; আমার বক্তব্য এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিজ নিজ চিন্তা ও বাক্য সম্বন্ধে বিশেষ অবহিত হওয়া উচিত। মনের প্রকোষ্ঠ হইতে দারিদ্র্য-চিন্তা ও দৈন্যের ভাব দূর করিয়া, তথায় ঐশ্বর্য্য-

লক্ষ্মীর আসন প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। নচেৎ জীবনে উন্নতিলাভ সুদূর-পরাহত।

হতাশার বাণী শুনিয়ো না, উচ্চারণ করিও না। উহা মানবের পরম শত্রু। সর্ব্বদা তোমার সম্মুখে রাখিবে সফলতার আদর্শ, মনে থাকিবে নিজের ক্ষমতায় অগাধ বিশ্বাস, এবং অভীপ্সিত বস্তু-লাভে বিপুল ভরসা। দেখিবে, প্রাণে যেন কি এক সজীবতা ও নবোত্মমের সঞ্চার হইয়াছে। কি যেন এক অজানা চুম্বক শক্তির প্রভাবে প্রকৃতির চিরন্তন নিয়মানুযায়ী তোমার অভীপ্সিত বস্তু ঠিক লৌহখণ্ডবৎ তোমার প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে। অর্থোপার্জ্জনের আদর্শে অনুপ্রাণিত হও, অর্থপ্রাপ্তি তোমার অবশ্যম্ভাবী!

তৃতীয় অধ্যায়

ভীতি ও দুশ্চিন্তা

মানব-জীবনে অকৃতকার্য্যতার যত কিছু কারণ থাকিতে পারে, মানসিক ভীতি তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। উহা মানব-হৃদয়ে সংশয়, সঙ্কোচ, দুশ্চিন্তা, অবসাদ ও নিজ ক্ষমতার প্রতি অবিশ্বাস ইত্যাদি নানা প্রকার প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি করিয়া থাকে। ভয় না থাকিলে,এই সকল অনাসৃষ্টির উদ্ভব হইত না। "কাপুরুষ ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্ব্বেও অনেক বার মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে"। সুতরাং কাপুরুষতা মহাপাপ। সংশয়রূপ শোষণ-পিশাচ তোমাকে মৃত্যুর কবলে ফেলিয়া দিতে সমুদ্যত। অচিরে উহাকে মন হইতে দূর করিয়া দাও। ভয় কি? ভগবান তোমার সহায়, হৃদয়ে তোমার অসীম বল। দেখিবে, তোমার মনোদ্যান নিষ্কণ্টক হইয়া কি এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে।

ভয় এবং তজ্জনিত পাপের ফলে মানুষের কত মহৎ চেষ্টা বিফল হইয়া যায়, কত শুভকার্য্য এবং সদুদ্দেশ্য-সাধনে ব্যাঘাত জন্মে! মানব জাতি এই অবাস্তব ভূতের

ভয়ে মোহাবিষ্ট। ইহার প্রভাবে দেশের আশা-ভরসার স্থল শত শত নরনারীর জীবন নিষ্ফলতা ও দুঃখে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

ভয় সর্ব্বপ্রথম দুশ্চিন্তার সৃজন করে; এই দুশ্চিন্তা একবার মনের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলে হৃদয়ের যাবতীয় সদ্‌বৃত্তিগুলিকে প্রচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। কোকিল যেরূপ কাক-নিলয়ে প্রবেশ করিয়া, অভ্যন্তরস্থ যাবতীয় কাক-অণ্ড বিনষ্ট করে, পরিশেষে নিজেই তথায় অণ্ডপ্রসব করিয়া শাবক জন্মায়, সেইরূপ ভয়ও সর্ব্বগুণবিধ্বংশী নৈরাশ্য ও দুশ্চিন্তার সৃজন করিয়া, হৃদয়কে অশান্তির আগারে পরিণত করে। মানুষ তখন বলিতে থাকে, "আমার ভাগ্য মন্দ", "আমি অক্ষম", ইত্যাদি। ফলে তাহার দৈহিক ও মানসিক সকল প্রকার শক্তিই নষ্ট হইয়া যায়। এইরূপে দুশ্চিন্তা মানব-জীবনে সকল উন্নতির অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়।

ভয় ও দুশ্চিন্তা মানুষের সমস্ত উদ্যম ও কর্ম্ম-প্রচেষ্টা নষ্ট করিয়া, পরিবর্ত্তে তাহাকে মঙ্গলকর কিছুই দিতে পারে না। ইহাই তাহাদের সর্ব্বাপেক্ষা দোষাবহ পরিণাম। ইহাদের সহায়তায় মানুষ উন্নতির পথে কোনদিন একটুও অগ্রসর হইতে পারে নাই এবং কখনও পারিবে কিনা সে বিষয়ে

সবিশেষ সন্দেহ। কারণ উহারা স্বভাবতঃই প্রগতির প্রতিবন্ধক। আমরা যত-খানি ভবিষ্যৎ ভয়ের কল্পনা করিয়া থাকি, তাহা অধিকাংশই সংঘটিত হয় না; যাহা কিছু বা হয়, তাহাও আমরা যতটা অশুভফলপ্রদ বলিয়া মনে করি, ঠিক ততটা নহে। বর্ত্তমানের দুঃখ-কষ্ট আমাদিগকে বেশী নিরুদ্যম করিতে পারে না। শুধু অনাগত ভবিষ্যতের ভাবনাই আমাদিগের সর্ব্বনাশের মূল। প্রায় প্রত্যেকেই বর্ত্তমান বিপৎপাতের প্রকোপ কোনোরূপে সহ্য করিয়া যাইতে পারে, কিন্তু "কাল-কি-হইবে," "পরশু-কি-হইবে" এবম্বিধ ভাবী দুশ্চিন্তার বোঝা মানুষের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দেয়।

এই কল্পিত ও ভাবী দুঃখের চিন্তা করিয়া আমরা যে পরিমাণ শক্তির অপচয় করি, তাহা যদি আমরা দৈনন্দিন দুঃখকষ্টের নিরসন-কল্পে নিয়োজিত করিতে পারি, তাহা হইলে উহা অনেকটা ফলপ্রদ হয়। ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য আমাদের মধ্যে প্রকৃতিদত্ত কিছু শক্তি সঞ্চিত আছে, উহার সাহায্যে আমরা দৈনন্দিন দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন্ হইতে সমর্থ হই। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, আমরা ঐ শক্তি অনাগত কাল্পনিক বিপদ্-চিন্তায় অপব্যয় করিয়া ফেলি। প্রকৃতপক্ষে ঐ সকল বিপদ্ হয়ত মোটেই

আসে না ; যখন বা আসে তখন আমরা রিক্তহস্ত ও হৃত-বল। সুতরাং পরাভব কিংবা অপমানকর প্রত্যাবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী।

বন্ধুগণ, তোমরা যদি একবার এই ভীতির অপচ্ছায়াকে মন হইতে বিতাড়িত করিতে পার, তাহাহইলে সমস্ত দুর্ভাবনার অবসান হইবে এবং জীবনের গতি অন্যরূপ হইয়া দাঁড়াইবে! তখন তুমি জানিতে পারিবে যে, জীবন কি মধুময়! দুশ্চিন্তার হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিলে, হৃদয়ে নববল ও প্রেরণার সঞ্চার হইবে এবং নূতন অনুভূতি, উৎসাহ ও আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইবে।

অতঃপর তুমি দেখিবে যে, ভয় দূরীভূত হওয়ায় লোকে আর তোমার মধ্যে কোনরূপ অকর্ম্মণ্যতার আভাষ পাইতেছে না। তাহারা আর তোমাকে অবিশ্বাস করে না। তোমার সুযোগ-সুবিধারও অভাব নাই। তোমাকে দেখিলে লোকের মনে জাগিবে বিপুল ভরসা, তোমার চরিত্র ও সামর্থ্যে জন্মিবে গভীর বিশ্বাস। এইরূপে তুমি সকলের প্রিয়পাত্র হইবে।

ভয় দূরীভূত হওয়ায় তোমার মধ্যে এক অপূর্ব্ব ভাবের সমাবেশ হইবে। কি যেন এক অজানা শক্তির বলে জগতের যাবতীয় মঙ্গলকর বস্তু তোমার প্রতি আকৃষ্ট

হইবে। এই মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিলে, আমরা দেখিতে পাই যে, আমরা যাহা কিছু চিন্তা করি, প্রতিমুহূর্ত্তে তাহার প্রতিচ্ছবি আমাদের অন্তরে অঙ্কিত হইতেছে ; এই ছবিই শেষে বাস্তবে পরিণত হয়। এই নীতি অনুযায়ী ভয় আমাদের মনে আধিপত্য বিস্তার করে এবং সমুদয় প্রেরণা ও কর্ম্ম-প্রচেষ্টা সমূলে বিনষ্ট করিয়া দেয়। আমাদের অধিকাংশ ভয় ও দুশ্চিন্তা আমাদের নির্বুদ্ধিতার পরিচয় ; একটু দৃঢ় সঙ্কল্প করিলে উহাদের উচ্ছেদ সাধন করা খুব দুষ্কর নহে। ভীতির আকর্ষণী-শক্তি হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে হইলে, ভয়ের ছায়ামাত্র কখনও মনে স্থান দিয়ো না।

এখন বুঝিতে পারিতেছ যে, যাহা কিছু তুমি ভয়ের বস্তু বলিয়া মনে কর, তাহাই তোমার প্রতি আকৃষ্ট হয়। ভয়ের প্রকৃত মূর্ত্তি বুঝিবার জন্য একটি উপমার সাহায্য গ্রহণ করা যাক। মিষ্টান্নপাত্রে অগ্নিসংযোগ করিলে, পক্ষযুক্ত পিপীলিকা যেরূপ তৎপ্রতি ধাবিত হয় এবং পরিশেষে উহাতেই পুড়িয়া মরে, সেইরূপ ভীতি-সঞ্জাত দুশ্চিন্তা-অনলে আমরাও যেন ঝাঁপাইয়া পড়ি এবং তিলে তিলে দহনজ্বালা অনুভব করিতে থাকি। সুতরাং ভয় সর্ব্বথা পরিত্যজ্য।

কিন্তু কিরূপে, এই ভয় হইতে মুক্ত হওয়া যায়, এই প্রশ্ন স্বতঃই মানব-হৃদয়ে জাগ্রত হইয়া থাকে। মনের প্রকোষ্ঠে যে আঁধার জমাট হইয়া আছে, তাহা জ্ঞানের আলোকে দূর কর, সাহসে বুক বাঁধ, নিজের ক্ষমতায় আস্থাবান হও, "উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত"...। এই মোহাবেশ ঘুচাইয়া দাও। কিছুতেই তুমি পশ্চাদ্‌পদ হইয়ো না। দেখিবে, আশার নবীন আলোক-সম্পাতে হৃদয় সতেজ ও উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে!

চতুর্থ অধ্যায়

বিশ্বাস

বিশ্বাস কথাটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং ব্যবহারগত বৈচিত্র্যের জন্যই ইহার অনেক দুর্ব্যাখ্যাও দৃষ্ট হয়। বিশ্বাস বলিতে কেহ কেহ বুঝিয়া থাকেন চিত্তের অসন্দিগ্ধভাব—যাহা কিছু বলা যায় তাহাই সত্য বলিয়া প্রতীতি হয়; বিচারের জন্য মন কখনও প্রতীক্ষা করে না। কিন্তু বিশেষ অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে, ইহার অপর একটি অর্থও আছে, যাহাতে ইহার যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ পায়। প্রাণের গূঢ়তম প্রদেশে ইহার অবস্থান এবং মানব-জীবনে যত কিছু প্রেরণা, তাহা মনের এই বিশেষ গুণ হইতে সমুদ্ভূত। ইহাই মানবের প্রগতির মূল কারণ। আমরা সাধারণ কথায় বলিয়া থাকি "বিশ্বাসে মিলয়ে হরি তর্কে বহুদূর।" যীশুর দ্বাদশটি প্রধান শিষ্যের অন্যতম St. John বলিয়াছেন :—

"Faith is the substance of things yet heard of or seen."

বাস্তবিক পৃথিবীর যে-কোন উন্নতিশীল ব্যক্তির জীবন-বৃত্তান্ত পাঠ করিলে, আমরা দেখিতে পাই যে, গোড়া হইতেই তাঁহার মনে ছিল নিজের ক্ষমতা এবং কর্ম্মফলে অগাধ বিশ্বাস। কেহ কেহ হয়ত মনে করিতে পারেন যে, অর্থোন্নতির সঙ্গে ইহার কি সংস্রব থাকিতে পারে? কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, অর্থোন্নতির মূলেও এই একই কথা। কর্ম্মারম্ভের প্রথমেই যদি কাহারও মনে সন্দেহ জাগে—"আমি ইহা কি করিতে পারিব?", তাহা হইলে তাঁহার কার্য্য-সিদ্ধির সম্ভাবনা সুদূর-পরাহত হয়, সংশয়-জনিত অলসতা তাঁহার উন্নতির পথে নানারূপ বাধা-বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়া থাকে এবং শেষে সমস্ত কার্য্যই পণ্ড হইয়া যায়। সুতরাং সকলেরই উচিত প্রথমতঃ নিজ কার্য্যক্ষমতায় আস্থাবান হওয়া; দ্বিতীয়তঃ বিনা কারণে কাহাকেও অবিশ্বাস না করা এবং সর্ব্বোপরি "নীতির" ক্রিয়া সম্বন্ধে অণুমাত্র সন্দেহ না রাখা।

লোকে একবার নিজের কর্ম্মক্ষমতায় বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিলে, অপরে তাহাকে কখনও বিশ্বাস করে না। তাহার পক্ষে যাহা কিছু মঙ্গলকর, সকলই যেন তাহার প্রতিকূল হইয়া দাঁড়ায় এবং দুঃখের উপর দুঃখ বাড়িয়াই চলে। শেষে মানসিক অবসাদ, দুশ্চিন্তা ও ক্লান্তি তাহাকে নিরুদ্যম

করিয়া দেয়। এইরূপে আত্মদোষ-কৃত পাপের ফলে তাহার জীবন ব্যর্থ হইয়া যায়।

নিরাশার পঙ্ক হইতে নিজেকে উদ্ধার করিতে হইলে, সর্ব্বপ্রথম তোমাকে হৃদয়ের দুর্ব্বলতা দূর করিতে হইবে—শক্তির সাধনা করিতে হইবে। প্রভাতে উঠিয়াই প্রথম প্রার্থনা করিবে, "হে পার্ব্বতী-পরমেশ্বর, হৃদয়ে আমার বল দাও, বাহুতে আমার শক্তি দাও, আমার সর্ব্বপ্রকার মোহ ঘুচাইয়া দাও, যেন আমি জীবন-যুদ্ধে কখনও পশ্চাৎ-পদ না হই।" দেখিবে, তুমি কি অসীম শক্তির অধিকারী, সিংহের ন্যায় তোমার বিক্রম। শুধু মোহবশে মেষচর্ম্মের আবরণে আবৃত ছিলে। একবার আত্মস্থ হইতে পারিলেই দেখিবে যে, জগতে তোমার পক্ষে কিছুই দুষ্কর নহে।

মানব-চরিত্র যেমন বহুবিধ বৈষম্য ও জটিলতাপূর্ণ, ততোধিক বিচিত্র তাহার কর্ম্মস্রোতের ঘাত-প্রতিঘাত। এইরূপ অবস্থায় লোকের ভুল-ভ্রান্তি হওয়ার খুবই সম্ভাবনা এবং সময় সময় কর্ম্ম-বিফলতাও তাহার অবশ্যম্ভাবী। তথাপি ইহাও নিঃসন্দেহে বলা যায় না যে, কোনও বিশেষ কার্য্যে একবার বিফলমনোরথ হইলেই তাহার শক্তির পরীক্ষা শেষ হইয়া গেল। গণনার ভুলে বা যে-কোন কারণেই

হউক, তাহাতে সময়োচিত সুযোগ-সুবিধার অভাব হইয়াছে। এই অবস্থায় তিনি কার্য্যান্তর গ্রহণ করিলে কিংবা আরব্ধ কার্য্য সময়ান্তরে পুনর্ব্বার চেষ্টা করিলে, সুফলও ফলিতে পারে। সুতরাং কোন অবস্থায়ই নিরাশ বা অবসাদগ্রস্ত হওয়ার বিশেষ কোনও কারণ নাই।

পূর্ব্বে একবার মনোজগতে আকর্ষণী-নীতির প্রভাব সম্বন্ধে (Law of attraction) কিছু বলা হইয়াছে। যেরূপ বস্তুজগতে সমগুণসম্পন্ন দ্রব্য সমগুণাত্মক দ্রব্যকে আকর্ষণ করে, সেইরূপ মনোজগতেও সমমতাবলম্বী ব্যক্তিগণ পরস্পর পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকেন। আবার লোকে আপন ধ্যান, ধারণা ও বিশ্বাস অনুযায়ী তাহার ফল প্রাপ্ত হয় এবং সুযোগ-সুবিধাও তাহার তদনুসারেই জুটিয়া যায়। সুতরাং কোনরূপ অনুকুল অবস্থার কামনা করিলে, আত্মক্ষমতায় কদাপি বিশ্বাস হারাইয়ো না।

ব্যবসা-ক্ষেত্রেরও মূল নীতি বিশ্বাস। কারণ, আমরা যদি একে অপরকে বিশ্বাস করিতে না পারি, তাহাহইলে ঋণ-দান কিংবা ঋণ-গ্রহণ সকলই অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায় বর্ত্তমান যুগে সকল ব্যবসায়ীই কিছু-না-কিছু পরিমাণে এই ঋণের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। বহু ব্যবসায়ীর পুঁজি

তাহার ব্যবসায়ের অনুপাতে যৎসামান্যই ; তাহারা আমদানী দ্রব্যের মূল্য দেয় প্রায় মহাজনের নিকট হইতে টাকা ধার করিয়া। মনে তাহার সর্ব্বদাই এই বিশ্বাস যে, তাহার বিক্রীত দ্রব্যের মূল্য যথা সময়ে মিলিয়া যাইবে এবং সে-ও মহাজনের টাকা পরিশোধ করিতে সমর্থ হইবে। পক্ষান্তরে তাহাদের নিম্নস্থ খুচ্‌রা বিক্রেতাকেও বহু স্থলে ঐরূপ বিশ্বাসে তাহারা পণ্য ধারে বিক্রয় করিয়া থাকে। ইহাদের যে কেহ ক্রমান্বয়ে বিশ্বাস ভঙ্গ করিলেই সমস্ত ব্যবসায়-যন্ত্র বিকল হইয়া যায়।

অন্যান্য সকল কাজেও আমরা এই একই নীতির প্রয়োগ দেখিতে পাই। ইহার ব্যত্যয় ঘটিলেই নানা-রূপ দুর্ঘটনার সৃষ্টি হইয়া থাকে। অনেকে স্বভাবতঃই সন্দিগ্ধচেতা। তাঁহারা মনে করেন যে, অপর সকলে সর্ব্বদাই তাঁহাদের অনিষ্ট সাধনে ও তাঁহাদিগকে প্রবঞ্চনা করিতে তৎপর। আবার কেহ কেহ অপরের বিরুদ্ধে কিছু শুনিয়া তাহাই নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করিয়া থাকেন,—কোনও সামান্য হেতুমূলের জন্য অপেক্ষা করা তাঁহাদের প্রকৃতি নহে। এতদুভয় অনুসৃত পন্থার কোনটিই ঠিক নহে। ইহাদের মাঝামাঝি কোন পথ ধরিয়া চলিলেই আমাদের মঙ্গল। কোনরূপ

সংস্কারের বশবর্ত্তী না হইয়া, শুদ্ধ-চিত্তে এবং নিরপেক্ষ-ভাবে সকলের সঙ্গে সদ্ভাব ও সৌখ্য বজায় রাখিতে ও সকলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে। বিনা কারণে অপরকে অবিশ্বাস করা নিতান্ত অন্যায়; কিন্তু তাই বলিয়া নিজের বিচার-বুদ্ধি বিসর্জ্জন দেওয়া সঙ্গত নহে।

আর্থিক উন্নতি করিতে হইলে, এই আত্মপ্রত্যয় এবং স্বজাতি-সৌখ্য ব্যতীত আরও এক বিষয়ে আস্থাবান হওয়া উচিত। উহা বৈষয়িক নীতিতে শ্রদ্ধা। কিরূপে ঐ নীতির ক্রিয়া সাধিত হয়, তাহাই এখন প্রামাণ্য। আমরা সাধারণতঃ দেখিতে পাই যে, যে-কেহ জীবনে উন্নতি লাভ করিয়াছেন, তিনিই কোন-না-কোন বহিঃ-সাহায্যে বিশ্বাসবান্, ঐকান্তিক চিন্তায় অথচ অল্প চেষ্টার ফলে প্রায়শঃ তিনি এই সাহায্য পাইয়া থাকেন। কিন্তু ইহার কোনও সঠিক সংজ্ঞা এখনও পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না। কেহ কেহ ইহাকে অদৃষ্ট বলিয়া থাকেন। সে যাহাই হউক না কেন, এই সহজ বিশ্বাস তাঁহাদিগকে জীবনের বন্ধুর পথে অগ্রসর হইতে বিশেষ সহায়তা করে; এবং চতুর্দ্দিকে যখন নৈরাশ্যের আঁধার জমাট হইয়া উঠে, তখন এই সাহায্যের আশা নবীন শুভ্র আলোক-

সম্পাতে জীবনের পথ সমুদ্ভাসিত করিয়া দেয়। যে কোন কৃতকর্ম্মা ব্যবসায়ীর জীবনেই এই ঘটনা বহুবার ঘটিয়াছে। এইরূপ বাহিরের কোন অজানা শক্তির সাহায্যে ধ্রুব বিশ্বাস, তাঁহাদের মধ্যে অদ্ভুত কর্ম্ম-শক্তির সঞ্চার করিয়া, প্রকৃতির মহান নীতির সহিত সুসঙ্গতি লাভে সহায়তা করে।

আত্মক্ষমতায় আস্থা স্থাপন কর, আপনাকে বিশ্বাস কর। ভয়ের কোনও কারণ নাই। বিশ্বাস ব্যতিরেকে কোনও কার্য্য সম্পন্ন হয় না,—ইহার প্রমাণ আমরা সর্ব্বদাই পাইয়া থাকি। কোন সময়ে গাড়ীতে উঠিলে, আমরা বিশ্বাস করি যে, নির্ব্বিঘ্নে গন্তব্য স্থানে পৌঁছিব। আবার ব্যাধি হইলে, চিকিৎসক আমাদের ব্যাধি আরোগ্য করিয়া দিবেন, ইহাই আমাদের সাধারণ ধারণা। আমরা দেখিতে পাই যে, আমাদের এই আশা প্রায়শঃ ফলবতী হইয়া থাকে। জাগতিক অন্যান্য অনেক বিষয়েও আমাদের অভিজ্ঞতা এইরূপই। এই যুক্তির বিপক্ষে যদি কোনও কারণ খুঁজিয়া না পাওয়া যায়, তবে ব্যবসায়-নীতির অনুসরণ করিলে যে কার্য্যে সফলতা লাভ করা যায়—এই সত্যে বিশ্বাস করিতে কি আপত্তি থাকিতে পারে? বরঞ্চ আমরা এইরূপ ধরিয়া লইতে পারি যে,

প্রকৃতির সর্ব্বত্রই যখন এক সামঞ্জস্য-নীতি (uniformity of nature) বর্ত্তমান, তখন ব্যবসায়-ক্ষেত্রেও ব্যবসায়-নীতির সহায়তায় কাজ করিলে, সুফল লাভের খুবই সম্ভাবনা।

পঞ্চম অধ্যায়

সুপ্তশক্তি

মানুষ অসীম শক্তির অধিকারী। কিন্তু মোহবশতঃ সে উহা বুঝিতে পারে না, জানিতে চাহে না। পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবে মেষপালিত সিংহ-শাবকের মতই তাহার প্রকৃতি ক্রমে দুর্ব্বলতা ও ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যদি সে একবার বুঝিতে পারে—তাহার মধ্যে কি অসীম শক্তি নিহিত আছে, যদি সে একবার বুঝিতে পারে যে, নিশ্চিতভাবে মনন ও চেষ্টা করিলে, তাহার পক্ষে কিছুই দুষ্কর ও অসম্ভব নহে, তাহা হইলে তাহার জীবনের ধারা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়; বাঞ্ছিত বস্তু লাভে তাহার আর বিশেষ বিঘ্ন ঘটে না। আমাদের অন্তর্নিহিত শক্তি সম্বন্ধে মনীষী লাওয়েলও (Lovell) একদিন এই কথাই বলিয়া গিয়াছেন।

সাধারণের ধারণা এই যে, তাঁহারা ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ মন লইয়াই জগতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এবং ভাগ্য-নির্দ্দিষ্ট

বিশেষ কোনও এক গণ্ডীর মধ্যে তাঁহাদিগকে চিরজীবন কাজ করিয়া যাইতে হইবে। ইহার বাহিরে যাওয়া তাঁহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ ও একরূপ অসম্ভব। নিজের শক্তি সম্বন্ধে এই যে তাহাদের ভ্রান্ত ধারণা, ইহাই তাঁহাদের উন্নতির প্রধান অন্তরায়। আমরণ তাঁহারা এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া জীবন-পথে উদাসীনভাবে চলিতে চেষ্টা করেন এবং উন্নতিও তাঁহাদের ঐ অনুপাতেই হইয়া থাকে। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, মানুষ অমৃতের সন্তান, নিখিল-বিশ্বের অধিকারী। অল্পে সন্তুষ্ট থাকা তাঁহার পক্ষে কোন মতেই উচিত নহে।

কোন শিক্ষিত ব্যক্তির কর্ম্মক্ষেত্রে অর্জ্জিত অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, তিনি জীবনের কোন-না-কোন সময়ে বিশেষ কিছু দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। ঐ কাজ করা তাঁহার হয় ত পূর্ব্বে একেবারেই অভ্যাস ছিল না। কিন্তু কার্য্য আরম্ভ করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মধ্যে কি যেন এক নূতন শক্তির সঞ্চার হইল, তিনি কার্য্যটি অক্লেশে সুসম্পন্ন করিয়া ফেলিলেন।

মানুষের শক্তি অপরিসীম বটে। কিন্তু তাঁহাকে গতি-পথে থামিলে চলিবে না।

কলিঃ শয়ানো ভবতি সঞ্জীহানস্তু দ্বাপরঃ।
উত্তিষ্টং স্ত্রেতা ভবতি কৃতং সম্পদ্যতে চরণ চরৈবতি ॥

—মানুষ শুইয়া থাকিলেই তাহার নাম কলিযুগ। উঠিয়া বসিলে, তাহার নাম দ্বাপর। দাঁড়াইয়া উঠিলেই তাহা ত্রেতা। মুক্তি-পথে যাত্রা করিলেই তাহা সত্যযুগ।

মানুষের এক জীবনেও এইরূপ চারিযুগের আবির্ভাব। যিনি মুক্তি-পথের যাত্রী, যিনি সগর্ব্বে, দৃঢ়চিত্তে বিপদের সম্মুখীন হন, বিপদ তাঁহার নিকট হইতে প্রায়শঃ দূরে পলায়ন করে; তিনি কদাচিৎ ব্যর্থমনোরথ হইলেও তাঁহার মধ্যে কার্য্যক্ষমতা বাড়িয়া যায়—তিনি এক নূতন শক্তির সন্ধান পান। এই সুপ্ত শক্তির কথা তাঁহার মনে হয়ত কোন দিনও উদিত হয় নাই! কিন্তু বর্ত্তমান যুগের বিজ্ঞান বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে যে, কোন নূতন কর্ম্ম-প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে মনের সুপ্তশক্তি জাগ্রত হইয়া উঠে এবং যাহা একদিন অসম্ভব বলিয়াই মনে হইত, তাহাও সম্ভবপর হইয়া দাঁড়ায়। তাই একদিন জগত্রাতা যীশু তাঁহার শিষ্যবৃন্দকে বলিয়াছিলেন—

"Seek and ye shall find, knock and the door shall be open unto you."

বিশ্ববিজয়ী নেপোলিয়ন তাঁহার বিশাল বাহিনী লইয়া

ইটালীর অভিমুখে রওনা হইলেন। পথে দুর্গম আল্‌প্‌স্ গিরিমালা লঙ্ঘন করিবার সময়, তাঁহার জনৈক সেনাধ্যক্ষ তাঁহাকে জানাইলেন, "আর তো অগ্রসর হওয়া যায় না". প্রত্যুত্তরে নেপোলিয়ন শুধু সংক্ষেপে বলিলেন, "The Alps and the Pyranese will sink before you". এই কৃতনিশ্চয়তা তাঁহার মধ্যে কিরূপে জন্মিল? কোন্ অজানা শক্তির বলে প্রণোদিত হইয়া, তিনি এই উৎসাহ-বাণী শুনাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন? ইহা আর কিছুই নহে—শুধু তাঁহার কর্ম্মযোগবল, অফুরন্ত আধ্যাত্মিক প্রেরণা! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কুরুক্ষেত্র সমরে এই উৎসাহ-বাণীই শুনাইয়াছিলেন—

'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ! নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।"

কর্ম্ম-প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে কিরূপে মানুষের সুপ্তশক্তি বিকশিত হয়, সেই উপলক্ষে আমার জনৈক বন্ধুর অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে কিছু লিপিবদ্ধ করিতেছি। বহুবৎসর কার্য্যক্ষেত্রে জীবন যাপন করিয়া, তিনি কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। হঠাৎ তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ায়, তিনি কর্ম্মশক্তি একেবারেই হারাইয়া ফেলিলেন। চিকিৎসাদিতে তাহার সমস্ত অর্থ ব্যয়িত হইয়া গেল। ইহার উপর পরিবার প্রতিপালনের চিন্তা তাঁহাকে পাগল করিয়া

তুলিল। এমতাবস্থায় তিনি তাঁহার জনৈক বন্ধুর মাসিক পত্রের মুদ্রন ও ভুল সংশোধনের ভার পাইলেন। ইহাতে তাঁহার কিছু আয় হইত বটে, কিন্তু তাহা যৎসামান্য। হঠাৎ ঐ মাসিক পত্রের কোন বিশেষ সংখ্যার জন্য কিছু লেখার অভাব হইলে, তাঁহার বন্ধু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কোন দিন কিছু লিখিবার চেষ্টা করিয়াছ?" উত্তরে তিনি জানাইলেন যে, এরূপ চেষ্টা জীবনে তিনি আর কখনও করেন নাই। তথাপি বন্ধুর অনুরোধে এবং অভাবের তাড়নায় তাঁহার একটু সাহস হইল। তিনি ভাবিলেন, "আমি এ সুযোগ হারাইতে পারি না। ভাল কাজের যখন সুযোগ পাইয়াছি, তখন আমাকে ইহা করিতেই হইবে।"

তিনি একবার গল্পে পড়িয়াছিলেন যে, একদা একটি বালক খাদ্যপ্রার্থী হইয়া কোন এক ধর্ম্মযাজকের গৃহে উপস্থিত হইলে, ধর্ম্মযাজক তাহার প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করিলেন এবং সদুপদেশ দিয়া ও শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে ভগবৎ প্রেমের এক অধ্যায় শুনাইয়া তাহাকে রিক্তহস্তে বিদায় দিলেন। তাহার ক্ষুন্নিবৃত্তি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু উচ্চবাচ্য করিলেন না। ইহাতে বালকটির চৈতন্যোদয় হইল; সে ভাবিল "বলং বলং আত্মবলং", অন্যের নিকট সাহায্য-ভিক্ষা

করিয়া সময়ক্ষেপ করা বৃথা। সে এক গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিয়া, সমস্ত দিন অনুসন্ধানের পর একটি বন্য কুক্কুট শিকার করিল। এইরূপে তাহার সেদিনকার মত আহার্য্য সংগ্রহ হইল। এই কথা স্মরণ হওয়ায় বন্ধুটি ভাবিলেন "উপদেশ তো অনেক শুনিয়াছি", এইবার যখন কার্য্যের সন্ধান মিলিয়াছে, আমাকে উহা করিতেই হইবে। এইরূপে তিনি এক সম্পূর্ণ নূতন কার্য্যে ব্রতী হইলেন। ক্রমে তাঁহার সুপ্তশক্তি জাগ্রত হইল। তিনি দেখিলেন যে, তাঁহারও যথেষ্ট লিখিবার ক্ষমতা আছে। তাঁহার উৎসাহ উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিল। এইরূপে গত সাত বৎসর কাল তিনি অনেক পুস্তক প্রণয়ন এবং মাসিক পত্র সম্পাদন করিয়া যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত প্রথম প্রবন্ধ লেখার ছয়মাস পরেই তিনি নিজেই একখানি পুস্তক লিখিয়া ফেলিলেন; অদ্যাবধি সে পুস্তকের বিংশ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। উহার দুই বৎসর পরে তিনি একখানি মাসিক পত্র সম্পাদন করিতে আরম্ভ করেন। এই মাসিক পত্র আজকাল প্রত্যেক সংখ্যায় প্রায় ৩ হাজার করিয়া মুদ্রিত হয়। কে জানিত, এই শক্তি তাঁহার মধ্যে নিহিত ছিল! শুধু এক মূহূর্ত্তের চেষ্টা ও সাহসের বলে ঐ শক্তি জাগ্রত হইয়া উঠিল।

আমি এই অধ্যায়ে যাহা লিপিবদ্ধ করিলাম, তাহা শুধু লোকের মনে সাহস জন্মাইবার ও তাহাদিগকে উৎসাহ দিবার জন্যই নহে। পরোক্ষে হয়ত ঐরূপ উদ্দেশ্য কিয়ৎ পরিমাণে সাধিত হইতে পারে। কিন্তু সকলেরই জানা উচিত যে, তাঁহার মধ্যে অসীম শক্তি নিহিত আছে; এবং উহা আজ্ঞাধীন ভৃত্যের ন্যায় তাঁহার সেবা করিতে তৎপর। হৃদয়ে প্রবল আকাঙ্ক্ষার অনল প্রজ্জ্বালিত কর; দেখিবে, সুপ্তশক্তি ক্রমশঃ প্রবুদ্ধ হইয়া তোমাকে জীবন-যুদ্ধে সহায়তা করিতেছে। এই শক্তি ও যোগ্যতা প্রকৃতির সেই মহান নীতির বলেই অর্জ্জিত হইয়া থাকে, যাহা অলক্ষ্যে আমাদের ভিতরে থাকিয়া কার্য্য করিতেছে। এই শক্তি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ মানুষের উন্নতির প্রথম সোপান।

তোমার অর্থোপার্জ্জন করিবার ক্ষমতা আছে—এই বিশ্বাস তোমার যদি না থাকে, তাহার একমাত্র কারণ এই অন্তর্নিহিত সুপ্ত শক্তিতে অবিশ্বাস। যদি সহসা এরূপ কোনও অবস্থার উদ্ভব হয় যে, তুমি তখন এই অজানা শক্তির উদ্বোধন করিতে বাধ্য, দেখিবে ভিতর হইতে সাড়াও আসিয়াছে, ভয়ের কোনও কারণ নাই। কার্য্য-সিদ্ধির জন্য জ্ঞান, বুদ্ধি, ক্ষমতা এবং নৈপুণ্য কোন কিছুরই অভাব হইবে না।

কাজ যত কঠিনই হউক, এবং স্বেচ্ছায় কিংবা বাধ্য হইয়াই আরম্ভ কর না কেন, কখনও দায়িত্ব এড়াইবার চেষ্টা করিয়ো না। সর্ব্বদা মনে মনে বলিবে, "এ কাজ আমি করিবই। ইহা আমার সাধ্যাতীত হইলে, কখনই ইহার ভার আমার উপর ন্যস্ত হইত না।" দেখিবে, শক্তি ও কার্য্য-ক্ষমতা তোমার ভিতর হইতে অজ্ঞাতে গড়িয়া উঠিতেছে।

জগতের যাবতীয় কৃতবিদ্য ব্যক্তি তাঁহাদের জীবনে এইরূপ অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য দিয়া থাকেন। অভাব অনুযায়ী উপায়ও অভাবনীয় রূপেই উদ্ভাবিত হয়। ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। চাহিদা অনুযায়ী জিনিষের যোগান্ হয়। আমাদের ব্যবহারের জন্য প্রকৃতির অফুরন্ত ভাণ্ডারে বিপুল ধনরাশি সঞ্চিত রহিয়াছে। প্রবল বাসনা জন্মিলেই উহা পাওয়া যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

উচ্চাভিলাষ

উচ্চাভিলাষ বলিতেই মনে এক অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হয় ; হৃদয়ের সমস্ত শক্তি যেন উন্মুখ হইয়া উঠে ; কি যেন এক নবীন উৎসাহ এবং বিপুল প্রেরণা মানুষকে কর্ম্মে প্রণোদিত করে ; সে যেন অভিনব সৃষ্টির অধিকারী, সর্ব্বকার্য্যে সাফল্য-লাভ করিতে সমর্থ।

উচ্চাভিলাষ বলিতে আমরা কি বুঝিয়া থাকি ? যাহা কিছু করা কিংবা প্রাপ্তির আগ্রহকেই উচ্চাভিলাষ বলা যায় না। আমাদের মনে যে আদর্শের প্রতিকৃতি অঙ্কিত আছে, তাহাকে মূর্ত্ত করিবার ব্যাকুল বাসনাকেই উচ্চাভিলাষ বলে। সুতরাং উচ্চাভিলাষ পোষণ করিতে হইলে আদর্শও উচ্চ হওয়া চাই। কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করার পূর্ব্বে তৎসম্বন্ধে আমাদের—মনে একটা আকাঙ্ক্ষা জন্মে। মনের এই যে ক্ষুধাবোধ ইহাই উচ্চাভিলাষের মুখ্য কারণ। সুতরাং যাহাতে এই ক্ষুধার উদ্রেক হয়, সে বিষয়ে সবিশেষ যত্নবান হওয়া উচিত।

মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, মানসিক ক্ষুধার মূলে এক বিশেষ নীতি বর্ত্তমান। এই ক্ষুধা সৃজন করিতে হইলে, মনশ্চক্ষুর সম্মুখে সর্ব্বদাই কোন-না-কোন আদর্শ ধরিয়া রাখিতে হইবে। যেরূপ খাদ্যদ্রব্য দর্শনে কিংবা উহার গন্ধে কিংবা উহার চিন্তা করিলেই পাকস্থলীতে পাচক রস নিসৃত হয়, সেইরূপ মানসিক ক্ষুধাও তন্নিবৃত্তির উপযোগী বস্তু দর্শন কিংবা চিন্তনে উদ্রিক্ত হইয়া উঠে। যদি কেহ জীবনের বর্ত্তমান অবস্থা লইয়াই সন্তুষ্ট থাকে, তবে সাধারণতঃ বুঝিতে হইবে যে, সে কোনও উচ্চতর আদর্শের সন্ধান পায় নাই অথবা তাহার সন্তুষ্টি শারীরিক কিংবা মানসিক অলসতা প্রযুক্ত। অজ্ঞানান্ধ বর্ব্বর তাহার তীক্ষ্ণাগ্র যষ্টির সাহায্যেই ভূমি কর্ষণ করিয়া থাকে, লৌহফলকবিশিষ্ট হল সম্বন্ধে তাহার কোনও ধারণা নাই। পিতৃপুরুষের পূর্ব্বতন প্রণালী অনুসারে সে কৃষিকর্ম্ম সম্পাদন করে। ইহা হইতে উৎকৃষ্ট যন্ত্র ব্যবহার করার আকাঙ্ক্ষা তাহার আদৌ নাই। এখানে তাহার অভাব কোনও উচ্চাদর্শের সৃষ্টি করিতে শিখে নাই। সে যদি কখনও দেখিতে পায় যে, লৌহ-যন্ত্রের সাহায্যে অল্পায়াসে এবং অল্পায়তনে অধিক ফসল উৎপন্ন করা যায়, তখন তাহার অভাব ও তন্নিবারণের উপায় সম্বন্ধে একবার বিচার করিয়া দেখিবার প্রবৃত্তি

জন্মে, এবং ক্রমে সে যষ্টিপরিত্যাগ করিয়া লৌহযন্ত্র ব্যবহার করিবার জন্য আগ্রহান্বিত হয়।

এখানে বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিতে হইবে যে, উচ্চাভিলাষের পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ হৃদয়ের প্রবল স্পৃহা। আবার উচ্চাভিলাষের সঙ্গে সঙ্গে প্রবল ইচ্ছা-শক্তিও জাগ্রত হইয়া উঠে। প্রবল স্পৃহা ও ইচ্ছাশক্তির অভাবে উচ্চাভিলাষ অর্থহীন। আমার হয়ত কোন দ্রব্য পাইবার জন্য প্রবল স্পৃহা জন্মিতে পারে; কিন্তু উহার সহিত ইচ্ছাশক্তির সংযোগ না থাকিলে উহা দুষ্প্রাপ্য এবং উচ্চাকাঙ্খা নিরর্থক। আবার কেহ হয়ত মনোবলে বলীয়ান, কিন্তু হৃদয়ে বাসনার সহিত ক্রিয়া-চাঞ্চল্যের উদ্রেক না হইলে অভিলাষ পূরণের সুযোগ কোথায়? সুতরাং তাহার হৃদয়ে কোনরূপ উচ্চাকাঙ্ক্ষা জন্মিতেই পারে না। যখন কেহ কোন বস্তু পাইবার জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে আকাঙ্ক্ষা করে এবং প্রবল ইচ্ছাশক্তি নিয়োগ করে, তখনই শুধু তাহার উচ্চাভিলাষ সম্পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়া থাকে। আকাঙ্ক্ষা এবং ইচ্ছা-শক্তি উচ্চাভিলাষের উপক্রিয়তার উপাদান।

উচ্চাভিলাষ ব্যতিরেকে কোন মহৎ কার্য্য সম্পাদন করা অসম্ভব। জগতে যাহারা যশঃ মান অর্জ্জন করিয়া-

গিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই উচ্চাভিলাষ দ্বারা কর্ম্মে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। বিশ্ববিজয়ী সমর-নীতিবিদ্ নেপোলিয়ন এবং সিজারের জীবনে ইহার জ্বলন্ত প্রমাণ পাওয়া যায়। বর্ত্তমান যুগের যাঁহারা ব্যবসা-ধুরন্ধর, তাঁহারাও সকল সময়ই কোন না কোন উচ্চাদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া থাকেন।

সর্ব্বাবস্থায় সন্তুষ্ট থাকা উচিত বলিতে অনেকে মনে করেন যে, যাহা আছে তাহা লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। এইরূপ মনোভাব তাঁহাদের কুশিক্ষার ফল কিংবা প্রাকৃতিক নীতি-বিরুদ্ধ। প্রকৃতি সকলের মধ্যেই তাহার বৃদ্ধি ও পুষ্টির উপযোগী দ্রব্য সংগ্রহের আকাঙ্ক্ষা সংবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। জগতের সর্ব্বত্রই আমরা এই নীতির ক্রিয়া দেখিতে পাই। বৃক্ষ-লতা, কীট-পতঙ্গ, পশু-পক্ষী সকলেই এই নীতি মানিয়া চলে। কিন্তু মানুষ ক্রম-বিবর্ত্তনের ফলে যতই উন্নতি-শিখরে আরোহণ করিতে থাকে, ততই তাহার কতকগুলি বাসনা এবং প্রবৃত্তি দমন করিবার প্রয়োজন হয়। কারণ উহারা তাহার উন্নতির পরিপন্থী। কিন্তু এই যুক্তিসূত্র অবলম্বন করিয়া, মানুষ তাহার গতি ঠিক বিপরীত দিকে ফিরাইয়া দিল। আকাঙ্ক্ষার কতকগুলি ব্যাধিগ্রস্ত শাখাকে কাটিতে গিয়া সে উহার সজীব, সতেজ শাখাগুলিও নষ্ট করিয়া ফেলিল। যাহারা এইরূপ

ভ্রম হইতে অব্যাহতি পাইল, জগতে তাহারাই কৃতিত্ব-লাভের অধিকারী হইল।

উত্তম দ্রব্য প্রাপ্তির আকাঙ্খা কেন লোকের মধ্যে থাকিবে না, ইহার কোনও পার্থিব কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কেন লোকে অন্যের অধিকারস্থ সুন্দর কিছু দেখিয়া ঠিক তদ্রূপ আর একটি পাইতে বাসনা করিবে না? ইহা না করিলে, তাহার উন্নতি কিরূপে হইবে? ইহাই হইল সভ্যতার ইতিহাসে গোড়াকার কথা—সর্ব্বদা নূতন নূতন অভাব সৃষ্টি এবং তাহা পূর্ণ করিবার প্রয়াস! ইহাই তো মানুষকে উন্নতির পথে আজ এতদূর বহিয়া আনিয়াছে। অনেকে বলিবেন, ইহা লালসা—হৃদয়ের এক হীনপ্রবৃত্তি। কিন্তু সত্যই কি তাই? ইহা তো অপরের দ্রব্য অপহরণ কিংবা বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লওয়ার ইচ্ছা নহে। ইহা শুধু অপরের অধিকারস্থ দ্রব্যের অনুরূপ অপর একটি পাইবার ইচ্ছা। এইরূপে লোকের অন্তরে উচ্চাভিলাষ জন্মিয়া থাকে এবং ইহা কোন প্রকারে অপ্রশংসনীয় নহে।

যখন জগতের সর্ব্বত্রই অভাব অনুযায়ী দ্রব্য-সম্ভার বিদ্যমান, তখন এইরূপ আকাঙ্ক্ষা লোভের কারণ না হইয়া তাহাকে মহত্তর কর্ম্ম-জীবন যাপনের উপযোগী করিতে পারে। হৃদয়ে একবার উচ্চাভিলাষ জন্মিলে, উহার

অসীম শক্তির প্রভাবে মানুষের নিকট সমস্ত কার্য্যই সহজসাধ্য হইয়া দাঁড়ায়।

উচ্চাকাঙ্ক্ষা মানুষকে অনেক সময় বিপথে পরিচালিত করিতে পারে; তাই বলিয়া হৃদয়ে কোনরূপ উচ্চাভিলাষ পোষণ করা উচিত নহে—এইরূপ উক্তি নিতান্ত অসমীচীন! শক্তির অপব্যবহারেই অশুভের উৎপত্তি; উপযুক্তভাবে প্রয়োগ করিতে পারিলে, উহা মঙ্গলজনক। যাঁহারা কোন মহৎকার্য্য সম্পন্ন করিতে চাহেন তাঁহারা উচ্চাভিলাষ পোষণ করা কখনও অন্যায় বলিয়া মনে করিবেন না। ভগবানের পতাকা বহন করা যাহাদের জীবনের ব্রত, তাহারা কেন অন্ধকারে বিভীষিকা দেখিয়া ভীত হইবেন? তাঁহারা সকল সময়ের জন্য সজ্জিত এবং শত্রুর সম্মুখীন হইতে বদ্ধপরিকর।

উন্নতির পন্থা নির্দ্দেশ করা গেল। নীতি অনুযায়ী কার্য্য করিলে উন্নতি অনিবার্য্য। যাহারা কুকার্য্যে রত, শুধু তাহাদের হস্তে এই অমোঘ অস্ত্র তুলিয়া দেওয়া উচিত নহে। ইহাতে অপর সকলের সমূহ ক্ষতি। কিন্তু যাঁহারা বুদ্ধিমান, তাঁহারা ইহার উপযুক্ত ব্যবহার করিয়া অনেক মহৎকার্য্য সাধন করিয়া থাকেন! জন-সাধারণ যখন এই নীতি অনুযায়ী কাজ করিতে শিখিবে, তখন আর

জগতের যাবতীয় উত্তম বস্তু অল্প সংখ্যক লোকের অধিকারে থাকিবে না, জগতে তখন অশুভের স্থানে শিব সুন্দর স্থাপিত হইবে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

আকাঙ্ক্ষা

পূর্ব্বলিখিত কোন কোন পরিচ্ছেদে লোকের আকাঙ্ক্ষা ও ইচ্ছা-শক্তি সম্বন্ধে কিছু আভাষ দেওয়া হইয়াছে এবং আরও বলা হইয়াছে কিরূপে উহারা তাহার অন্তর্নিহিত শক্তিকে জাগ্রত করিয়া তোলে। যাহা হউক, এই সম্বন্ধে কোন যথোপযুক্ত আলোচনা এপর্য্যন্ত হয় নাই। অনেকে মনে করেন যে, আকাঙ্ক্ষা মানুষের অন্তরে দুষ্প্রবৃত্তি জন্মাইয়া তাহাকে পাপের পথে লইয়া যায়; তাঁহারা বলেন —কামনা বর্জ্জন করিতে না পারিলে, লোকের মুক্তি নাই। তাঁহারা আপনাপন মনোবৃত্তি অনুযায়ী ইহার কদর্থ করিয়া থাকেন। কিন্তু একটু বিচার করিলেই আমরা দেখিতে পাই যে, এইরূপ যুক্তি তাঁহাদের স্বাভাবিক অলসতা এবং কর্ম্মে অনিচ্ছাকে প্রশ্রয় দেওয়ার জন্য ব্যতীত আর কিছুই নহে। এমন কি, আকাঙ্ক্ষা স্বার্থ কিংবা লালসাবর্জ্জিত হইলেও মানুষকে কর্ম্মে প্রণোদিত করিতে পারে। তবে এই জন্য লোকের জীবনে কোন উচ্চ আদর্শ থাকা চাই। দৃষ্টান্ত

স্বরূপ আমরা দেখিতে পাই, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র-সমরে অর্জ্জুনকে ধর্ম্মযুদ্ধে যোগদান করিতে ইচ্ছুক করিবার জন্য বলিতেছেন—

"ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ॥"

কিন্তু এই 'সর্ব্ব কর্ম্ম আমাতে অর্পণ' করার অর্থ—নিশ্চেষ্টতা কিংবা কর্ম্ম-বিরতি নহে। তাহা হইলে যুদ্ধ করিতে বলিতেছেন কেন? এখানে উদ্দেশ্য কর্ম্মের জন্যই কর্ম্মে আকাঙ্ক্ষা জন্মাইয়া দেওয়া; কর্ম্ম আরম্ভ না করিয়াই কল্পনার নেশায় মস্‌গুল হইয়া তাহার ফলাফলের চিন্তা নহে।

যাহা হউক, সাংসারিক মানুষের কোনরূপ আকাঙ্ক্ষা না থাকিলে, তাহার পক্ষে সংসার-পথে চলাই দুষ্কর। সে যখন বিশেষ কোনও সঙ্ঘ কিংবা সমাজের সভ্য, তখন তাহাকে কতকগুলি নিয়ম-কানুন মানিয়া চলিতেই হইবে। আবার জীবন-ধারণের জন্যও তাহার অনেক কিছু দরকার—যশ, মান, ধন, কিছুই বাদ দিলে চলিবে না; সেইজন্যই আমরা দেবতার কাছে প্রার্থনা করিয়া থাকি—"জয়ং দেহি যশোং দেহি" ইত্যাদি। তবে আমাদের এই আকাঙ্ক্ষা সুপরিচালিত হওয়া উচিত। পরস্পারের স্বার্থে সংঘর্ষ যত কম হয়, সে দিকে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

আমাদের মন জলপূর্ণ পাত্রের ন্যায় ; আকাঙ্ক্ষা যেন তন্নিম্নস্থ অগ্নি। আগুনের উত্তাপ বর্দ্ধিত হইলেই জল বাষ্পাকারে পরিণত হয় এবং উহার শক্তি-সাহায্যে নানারূপ যন্ত্র চালিত হইয়া থাকে। এখানে আমরা বাষ্পের অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত হই ; কিন্তু উহার সৃষ্টির গোড়াকার কথাটা ভুলিয়া যাই। সেইরূপ মনোবলের অদ্ভুত ক্রিয়া আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই বটে ; কিন্তু আকাঙ্ক্ষাবর্জ্জিত মনের শক্তি কোথায় ? মনে আকাঙ্ক্ষার অনল জ্বলিলেই উহা কার্য্যকরী ক্ষমতা পাইয়া থাকে।

জলের সঙ্গে মনের অনেকটা সৌসাদৃশ্য আছে। জল যেরূপ অস্থির—সর্ব্বদাই আবর্ত্তপূর্ণ, বাত্যা-বিক্ষুব্ধ এবং বীচিমালা-সঙ্কুল, আবার কখনও কখনও নির্ব্বাত নিষ্কম্প স্থির, মনও ঠিক সেইরূপ। পরন্তু আকাঙ্ক্ষাও অগ্নির মতই—একবার প্রজ্জ্বলিত হইলে, উহার উত্তাপে মানুষের মনে ইচ্ছা-শক্তির উদ্ভব হয় এবং অভীষ্ট সিদ্ধির উপযোগী সকল বস্তু আকর্ষণ করা যায়। সুতরাং আকাঙ্ক্ষা বর্জ্জন করা কদাপি বাঞ্ছনীয় নহে।

আকাঙ্ক্ষার আগুণে মনোবারিকে উত্তপ্ত করিলে, ইচ্ছা-শক্তি উদ্ভূত হইয়া মনের অপরাপর শক্তিসমূহকে পরিচালিত করে এবং তখন লোকের শক্তিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়।

কিন্তু যাহার কোনও আকাঙ্ক্ষা নাই—যে ব্যক্তি বিগত বিষয়ের অনুশোচনা করিয়াই দিন কাটায়, তাহার জীবন দুঃখেই পর্য্যবসিত হয়। সময় সময় সে কিছু করিবার মানস করে বটে ; কিন্তু তাহার এই সাময়িক ইচ্ছা ও উত্তেজনা ক্ষুদ্র মৃৎপাত্রস্থ ঈষদোষ্ণ জলের মতই—ক্ষণিক পরে আবার শীতল হইয়া যায়, বিশেষ কোনও কার্য্যক্ষমতা লাভ করিতে পারে না।

হৃদয়ে কোন কিছুর জন্য প্রবল বাসনা জন্মিলেও কিন্তু ইচ্ছা-শক্তি-জনিত কর্ম্মক্ষমতার অভাবে উহা প্রাপ্তির সম্ভাবনা খুব কমই থাকে। শুধু কোন কিছু করিবার কিংবা পাইবার অভিলাষ থাকিলেই চলিবে না, সমস্ত মন-প্রাণ দিয়া উহার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। বুভুক্ষিত মানুষ যেমন অন্নের জন্য লালায়িত হয়, শ্বাস-নিরোধের উপক্রম হইলে যেমন লোকে মুক্ত বায়ুর জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে, সেইরূপ অভীপ্সিত বস্তু লাভের জন্য আমাদের আকাঙ্ক্ষা দুর্নিবার ও প্রবল হওয়া উচিত। লোকের মনে একবার দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা জন্মিলে, তাহার সুপ্ত মানসিক শক্তি জাগ্রত হইয়া উঠে এবং কার্য্যে ব্যক্ত হয়। যদি কেহ মরণ-পণ করিয়া কোন কার্য্য সাধনে তৎপর হয়, শত বাধা বিঘ্ন তাহাকে লক্ষ্য হইতে বিচ্যুত করিতে পারে না, তাহার

মধ্যে তখন এক অদ্ভুত শক্তির আবির্ভাব হয় ; মানব-সত্বার এই অস্থির শক্তি-সঞ্চারিণী বৃত্তিকেই আমরা আকাঙ্ক্ষা বলিয়া থাকি।

আমরা জীবনে যত কিছু কাজ করি, সকল সময়ই যে তাহা ভাল বলিয়া করিয়া থাকি, তাহা নহে। কখনও কখনও শুধু ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়াই ঐরূপ কাজে লিপ্ত হই—কোন বিশেষ উদ্দেশ্য থাকে না। এখানে প্রাণের আকাঙ্ক্ষাই বলবতী। আমাদের সকল কাজ, অনুভূতি, আবেগ এবং আত্ম-প্রকাশের মূলে এই চিরন্তনী আকাঙ্ক্ষা বর্ত্তমান। কাহারও প্রতি ভালবাসা কিংবা ঘৃণা জন্মিবার পূর্ব্বে মনে ঐরূপ কোনও ভাবের উদ্রেক হয় এবং উহা কার্য্যে ব্যক্ত হয়।

প্রত্যেক জাতির বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠে ঐ জাতির অন্তর্গত সভ্যবৃন্দের আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তিতে। যে পরিমাণে তাহারা উচ্চাভিলাষ পোষণ করে এবং নিজেদের ব্যক্তিত্ব প্রকাশে দৃঢ় সংকল্প হয়, সেই পরিমাণে তাহারা জগতের নিকট সম্মান লাভের অধিকারী। যাহারা জাতির অবলম্বন, তাহাদের মধ্যে আমরা দেখিতে পাই সর্ব্বদাই কিছু না কিছু করিবার কিংবা পাইবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা—নূতন কিছু সৃষ্টি, সংস্কার অথবা পরিবর্ত্তন করিবার ইচ্ছা।

কর্ম্মফলের দিকে তাহাদের বিশেষ ভ্রূক্ষেপ নাই। শুধু সৃষ্টির অভিলাষ তাহাদিগকে কর্ম্মে প্রণোদিত করে।

অর্থোন্নতির আকাঙ্ক্ষা মনে জাগ্রত হইলে, তাহার নির্দ্দেশানুযায়ী পন্থা অনুসরণ করিতে ভীত হইয়ো না। গত জীবনের যাহা কিছু বিফলতা কিংবা নৈরাশ্য সকল ভুলিয়া যাও, উহারা তোমার উন্নতির পথে কণ্টক স্বরূপ। হৃদয়ে তোমার আশার অগ্নি সর্ব্ব সময়ের জন্য প্রজ্জ্বলিত করিয়া রাখ, বাহিরের প্রলোভন যেন তোমার মনকে বিক্ষিপ্ত করিতে না পারে। কারণ মনের একাগ্রভাব না জন্মিলে, শক্তিসঞ্চয় করা অসম্ভব। আকাঙ্ক্ষিত বস্তুলাভ করিতে হইলে একনিষ্ঠার নিতান্ত প্রয়োজন। যাহা তোমার হইতে পারে বলিয়া বিশ্বাস, তাহার উপর তোমার দাবী স্থির কর। নিখিল বিশ্বের অভাব অনুযায়ী দ্রব্য-সম্ভার সর্ব্বদাই বিদ্যমান। অন্তরে প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মিলেই উহা পাওয়া যায়। কিন্তু শুধু একবার চাহিয়া, নিশ্চেষ্ট থাকিলেই চলিবে না।

আকাঙ্ক্ষা মানুষের উন্নতির উপযোগী মনোবৃত্তি গঠন করিয়া থাকে, লোকের অন্তরের বিশ্বাস তাহার আকাঙ্ক্ষা-প্রসূত। উহা সুপ্তশক্তি জাগ্রত করিয়া দেয়, মনে উচ্চাভিলাষের সৃজন করে, কায়মনোবাক্যে অর্থাকাঙ্ক্ষা কর, সুযোগের কখনও অভাব হইবে না।



অষ্টম অধ্যায়

ইচ্ছাশক্তি

ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ কবি টেনিসন বলিয়াছেন, "যাহার ইচ্ছাশক্তি প্রবল, সেই ব্যক্তিই ভাগ্যবান!" সকল সময়ে সর্ব্বদেশের মনীষীবৃন্দের মুখে আমরা এই কথাই শুনিতে পাই। মানব-মনে ইচ্ছাশক্তি সম্বন্ধে যে উচ্চ ধারণা, তাহা সুস্পষ্টরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে কবির এই উক্তিতে। ইচ্ছা-শক্তির গুণকীর্ত্তন করিতে গিয়া তিনি আরও বলিয়াছেন যে, বিশ্বের সকল বস্তুর সত্বা বিনষ্ট হইলেও ইচ্ছাশক্তি অবিনশ্বর।

মানুষের মননশক্তি এক অতি সূক্ষ্ম এবং অদৃশ্য বস্তু। তথাপি ইহার সত্বা নিশ্চিত এবং মানুষের অহংভাবের সারভূত প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এই অহংভাব কার্য্যকরী হয় মনন-সাহায্যে। মানব-সত্বার আশ্রয়ভূত অহংভাবের সাক্ষাৎ প্রকাশ এই ইচ্ছাশক্তি। আমাদের অভ্যন্তরস্থ অহংভাব অথবা আমাদের সত্বার গুঢ়তম প্রদেশে অবস্থিত আত্মা দুইভাবে ব্যক্ত হইয়া থাকে। প্রথমে "আমি আছি"—এই

কথায় আমরা প্রমাণ পাই আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে। অতঃপর "আমি ইচ্ছা করি"—এই কথায় প্রকাশ পায় উহার কার্য্য করিবার ইচ্ছা এবং তদুদ্দেশ্যে উহার স্থির সংকল্প "আমি করিব কিংবা করিতে ইচ্ছা করি"—এইরূপ উক্তি মানব-সত্বার কেন্দ্র হইতে উদ্ভুত এবং তাহার অভ্যন্তরস্থ মহান প্রাণ-শক্তির সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি। যে পরিমাণে উহার অনুশীলন করা কিংবা বাহ্যিক আকার দেওয়া যায়, সেই পরিমাণে মানুষ সর্ব্ব বিষয়ে নিশ্চয়তা লাভ করে। ইচ্ছাশক্তির অভাবে মানুষ দুর্ব্বল এবং সর্ব্বদা সংশয়গ্রস্ত হয়; আবার ইচ্ছাশক্তি প্রবল হইলেই তাহার মধ্যে সাহস. কৃতনিশ্চয়তা জন্মে এবং তাহার ক্ষমতা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। পরিশেষে প্রকৃতি সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে জয়মাল্যে ভূষিত করেন।

মনন (ইচ্ছাশক্তি) এক বাস্তব ও জীবন্ত শক্তি। তড়িৎ, চুম্বক কিম্বা মাধ্যাকর্ষণ প্রভৃতি শক্তির ন্যায় ইহাও প্রাকৃতিক শক্তির অন্যতম। কীট-পতঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া মানুষ পর্য্যন্ত জৈব-প্রাকৃতিক সকল বস্তুর মধ্যেই আমরা অল্প-বিস্তর আকাঙ্ক্ষা ও ইচ্ছাশক্তির প্রমাণ পাই। মনুষ্যেতর প্রাণীর মধ্যে এই আকাঙ্ক্ষা ও ইচ্ছাশক্তি অবশ্য অনেকটা নিয়ন্ত্রিত হয় তাহার সহজ বুদ্ধি (instinct)

দ্বারা। প্রথমে জাগ্রত হয় কার্য্য করিবার আকাঙ্ক্ষা, তৎপরে ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে ঐ কার্য্য সম্পন্ন হয়। স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি সকল বস্তুর মধ্যেই এই নীতি ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে এবং সর্ব্বদা ক্রিয়া করিতেছে।

প্রবল ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে কিছুই অসম্ভব নহে। ইচ্ছাশক্তির উদ্ভব লোকের নিজ সামর্থ্যে বিশ্বাস হইতে। সুতরাং আত্মক্ষমতায় বিশ্বাস সকল কার্য্য-সিদ্ধির মূল কারণ; ইচ্ছাশক্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ লোকের আত্মক্ষমতায় বিশ্বাস। অনেকের মধ্যে হয়ত প্রবল ইচ্ছাশক্তি লুক্কায়িত রহিয়াছে, কিন্তু অজ্ঞানতা বশতঃ তাহারা উহা প্রয়োগ করিতে অসমর্থ। যদি কোন সময় বিশেষ কোনও কার্য্যোপলক্ষে উহা দরকার হয়, তখনই তাহাদের শক্তি জাগ্রত হইয়া উঠে। দুর্ভাগ্যক্রমে অনেকেই এইরূপ সুযোগলাভে বঞ্চিত।

ইচ্ছাশক্তির অর্থ যুক্তিহীনতা ও অবাধ্যতা নয়। এমন অনেক লোক আছে, যাহারা ক্ষিপ্ত অশ্বতরের মতই নেহাৎ নাছোড়্‌বান্দা। তাহাদের সম্বন্ধে সকলের অভিমত এই যে, তাহারা একবার "না" বলিলে, হাজার যুক্তি-তর্ক দিয়াও আর "হাঁ' বলান যায় না। এইরূপ মানসিক বৃত্তি খুব প্রশংসনীয় নহে, কিংবা ইহাকে ইচ্ছাশক্তিও বলা

যায় না। ইহা মানুষের কুসংস্কার এবং অজ্ঞানতা-সঞ্জাত। ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি জানেন কখন প্রত্যাবর্ত্তন তাঁহার পক্ষে সুবিধাজনক, আবার কখনই বা অগ্রসর বাঞ্ছনীয়। তিনি সর্ব্বদাই গতিশীল, সময়বিশেষে তিনি কখন কখন প্রত্যাবর্ত্তন করেন; কিন্তু তাই বলিয়া লক্ষ্য হইতে বিচ্যুত হন না—সর্ব্বদাই সুযোগ-সুবিধার অনুসন্ধানে থাকেন। প্রাণের ভিতর হইতে আবার যখন ডাক আসে, তখন তিনি অগ্রসর হন্—ঠিক যেমন বিশাল বাণিজ্যতরী বিপুলগর্ব্বে এবং নির্ভীকভাবে সাগরের বক্ষ ভেদ করিয়া অগ্রসর হইতে থাকে। চিত্তের এই অবস্থা বিশ্বপ্রেমিক হাওয়ার্ড্ সম্বন্ধে লিখিত নিম্নোদ্ধৃত বাক্যাবলী হইতে সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

"তিনি এরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন যে, যদি না তাঁহার চিত্তের ওজঃভাব ক্রমশঃ ব্যক্ত হইয়া একবারে নিঃশেষে প্রকাশ পাইত, তাহা হইলে উহার উগ্রতাই পরিলক্ষিত হইত। কিন্তু ধারাবাহিকভাবে ব্যক্ত হওয়ায় উহা এরূপ একসমতা লাভ করিয়াছিল যে, তখন উহার প্রচণ্ড ভাব লোপ পাইয়া, শুধু স্থির প্রশান্ত মূর্ত্তিই প্রকটিত হইত। মানবপ্রকৃতিতে এমন কিছু গুণ নিহিত আছে, যাহার বলে হৃদয়ের উদাত্তভাবগুলি সেই পরিমাণে নিবৃত্তি লাভ

করে—যাহা তাহাকে সীমালঙ্ঘন করিলেই সতর্ক করিয়া দেয়; আবার তাহার চরিত্রে এরূপ বৈশিষ্ট্য আনয়ন করে যে, সে জন্য সে কখনও পিছনে পড়িয়াও থাকে না।

এই ক্ষুদ্র পুস্তকে ইচ্ছাশক্তি সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা অসম্ভব। এতৎ সম্বন্ধে বহু পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে আমার ধারণা Mr. Haddock-লিখিত "Power of Will" এবং "Power for Success" বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। উল্লিখিত গ্রন্থকারের মতে মানুষের শক্তিমত্তা তাহার মনের উপর নির্ভর করে। জগতে কোন মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিতে হইলে, আপনার মধ্যে প্রবল ইচ্ছাশক্তি সৃজন করিতে হইবে। সর্ব্বপ্রথম ভবিষ্যৎ সৌভাগ্যে বিশ্বাসবান হওয়া উচিত। অতঃপর প্রতি-নিয়ত "আমি পারি কিংবা আমি করিবই" এইরূপ মনো-বৃত্তি লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হয়। এতদ্‌কল্পে নানাবিধ উচ্চাঙ্গের সাহিত্য হইতে সংগৃহীত উপদেশা-বলীর অনেক সাহায্য পাওয়া যায়। উহাদের নির্দ্দেশ অনুসারে ক্রমশঃ চরিত্রের উন্নতি সাধন করিতে পারিলে, লোকের মধ্যে এরূপ শক্তি জন্মে যে, তখন আর কোনরূপ প্রলোভন তাহাকে জীবনের লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট করিতে পারে না। এই পরিচ্ছেদের শেষ ভাগে

কয়েকটি নীতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল। ঐ গুলিকে স্মরণ রাখিতে পারিলে, বিপদ ও নৈরাশ্যের সময় যথেষ্ট উপকারে আসিতে পারে।

অর্থলাভেচ্ছু ব্যক্তির সর্ব্বদাই মনে "আমি পারি এবং আমি করিবই" এইরূপ ভাব থাকা উচিৎ। এই মনোবৃত্তির মধ্যেই কার্য্যসিদ্ধির মূলতত্ত্ব নিহিত আছে, ইহাতে মানুষের মনে নিজ ক্ষমতার প্রতি অগাধ বিশ্বাস জন্মে এবং ক্ষমতা-বোধ তাহার ইচ্ছাশক্তির গতিপথ উন্মুক্ত করিয়া দেয়। অতঃপর আমরা দেখিতে পাই, ইচ্ছাশক্তির কার্য্যকরী ক্ষমতা। ইহার সাহায্যে মানব-মনের সমস্ত শক্তি জাগ্রত হইয়া উঠে এবং প্রচণ্ডবেগে সম্মুখের বাধাবিঘ্ন ঠেলিয়া লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে।

মানুষের এই ইচ্ছাবৃত্তি শুধু তাহার সুপ্ত অন্তর্নিহিত শক্তিকে জাগ্রত কিংবা কার্য্যসিদ্ধির সহায়ক করিয়াই ক্ষান্ত হয় না; পারিপার্শ্বিক অপর সকলেও ইহার প্রভাব অনুভব করিয়া থাকে। প্রবল ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির কথা কেহ উপেক্ষা করিতে পারে না এবং জীবন-যুদ্ধে তাহার জয় পদে পদে। যুদ্ধ ক্ষণকালস্থায়ী কিংবা বহুদিন-ব্যাপী হইতে পারে, কিন্তু তাহার প্রগতি-রোধ করা অসম্ভব।

ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়া এইখানেই শেষ হয় না; ইহার প্রভাবে কতগুলি স্বাভাবিক শক্তি পরিচালিত হইয়া মানুষের দিকে আকৃষ্ট হয় এবং একটি প্রবল শক্তিকেন্দ্র গড়িয়া তোলে। এই শক্তির সাহায্যে মানুষ অনেক দুষ্কর কার্য্য সম্পন্ন করিতে সমর্থ হয়, দূর কিংবা নিকটস্থ সকল বস্তুই তখন তাহার কার্য্যানুকূল হয় এবং এই আনুকূল্যের পরিমাণ তাহার ইচ্ছাশক্তির প্রাবল্যের উপর নির্ভর করে।

নিম্নে কয়েকটি উপদেশ উদ্ধৃত করা গেল :—

"ইচ্ছাশক্তি বর্দ্ধিত এবং নিয়ন্ত্রিত করা জীবনের এক প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত।"

"শুধু তাহারাই কোন কিছু করিতে সক্ষম, যাহারা মনে করে 'আমরা কিছু করিতে পারি।' আপন ইচ্ছাকে সুচারুরূপে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিলে, চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করা যায়।"

"যে ব্যক্তি সত্য ও শিবের সন্ধান পাইয়াছে এবং উহা লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল, জগতে এমন কিছুই নাই, যাহা তাহার গতিরোধ করিতে পারে।"

"যাহা কুৎসিৎ তাহার আকাঙ্খাই মৃত্যু। বিপথে পরিচালিত ইচ্ছাশক্তি আত্মহত্যার সূচনা করে।"

"বিপদ যত ভীষণই হউক না কেন, উহাদের সম্মুখীন হইতে বাধা-বোধ করিও না, কিংবা কখনও মনোবল হারাইও না; কারণ তোমার মধ্যে অসীম শক্তির ভাণ্ডার পড়িয়া আছে। শুধু উহাতে আস্থা থাকিলে এবং উহাকে ব্যবহার করিতে জানিলেই সর্ব্বপ্রকার বিপদ ও সংঘর্ষ হতবল ও দূরীভূত হইবে।"

"অজেয় ইচ্ছাশক্তির আদর্শ তোমার অন্তরাকাশে শুভ্র, শান্ত, ধীর, স্থির তারকার ন্যায় বিরাজমান হউক।"

"মর্ত্ত্যের মাটীর কি অপূর্ব্ব গরিমা! মানুষ দেবতার আসনের অধিকারী। কর্ত্তব্যের মন্ত্রগুঞ্জনে যৌবনের উৎসাহ বাড়িয়া যায়। সে কর্ম্মক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়ে, কারণ সে দুর্জ্জয়, সে শঙ্কাহীন।"

"আমি মনোবল বর্দ্ধিত এবং উহার যথোপযুক্ত ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করি। আমি ক্রমাগত উহার অনুশীলন করিব এবং কোন নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করিয়া আমার বিবেক বুদ্ধি, জ্ঞান ও সততার নির্দ্দেশ অনুযায়ী উহাকে পরিচালিত করিব।"

"মানুষের অবিনশ্বর আত্মাশ্রিত অদৃশ্য ইচ্ছাশক্তি পর্ব্বত-প্রমাণ বাধাবিঘ্ন অপসারিত করিয়া, তাহাকে যে কোন গন্তব্য স্থানে পৌঁছাইয়া দিতে সমর্থ।"

"মনের কামনা এবং ব্যাকুলতা অনুযায়ী লোক সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে। কেহ কেহ একবার অকৃতকার্য্য হইলেই পারিপার্শ্বিক অবস্থার দোহাই দিয়া নিশ্চেষ্ট হয়; কিন্তু মনোবলে বলীয়ান ব্যক্তি ঐরূপ উক্তি ঘৃণাজনক বলিয়া মনে করেন। তাঁহার চিত্ত স্বাধীন। তিনি ত্রিদিব ও ত্রিকালের অতীত, দৈব তাঁহার আয়ত্তাধীন, অবস্থা-বৈষম্য তাঁহার উপর কোনও প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না।

যাহার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মন, সে কখনও দৈব, অদৃষ্ট কিংবা নিয়তির বাধ্য নয়। সে কখনও দান কিংবা অনুগ্রহের প্রতীক্ষা করে না—আপন গৌরবে একা একা সম্মুখে অগ্রসর হয়। তাহার প্রবল ইচ্ছার কাছে সমস্ত পরাভূত। জগতে এমন কোনও শক্তি নাই যাহা তাহার পথে বিঘ্ন জন্মাইতে পারে। সাগরগামিনী স্রোতস্বতীর গতিপথ পরিবর্ত্তন করা কিংবা সূর্য্যকে কক্ষচ্যুত করা যদি বা সম্ভবপর, কিন্তু একাগ্র মনোবলের প্রতিরোধ করা সত্যই দুঃসাধ্য। মূর্খেরা দৈবের উপর নির্ভর করে। যিনি স্থিরপ্রতিজ্ঞ তিনিই ভাগ্যবান। তাহার প্রত্যেক কর্ম্মপ্রচেষ্টা এবং কর্ম্মবিরতি এক মহান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত সভয়ে তাহার নিকট হইতে ক্ষণকালের জন্য সরিয়া দাঁড়ায়!"

নবম অধ্যায়

আভিভাব

মানসিক অবস্থার উৎকর্ষ সাধন করিতে পারিলে কিরূপে মানুষ অর্থোপার্জ্জন-নীতির আনুকূল্য লাভে সমর্থ হয়, ইহাই পূর্ব্বোক্ত কয়েকটি অধ্যায়ে বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

আপনাদের হয়ত মনে আছে যে, অর্থকে আমি এক নূতন রূপে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। ইহাও ঠিক যেন বৃক্ষাদির পুষ্টির উপাদানের ন্যায় প্রকৃতির চাহিদা ও যোগানের (supply and demand) এক দুর্লঙ্ঘ্য নিয়ম মানিয়া চলে।

দ্বিতীয়তঃ বলা হইয়াছে যে, অর্থোন্নতি করিতে হইলে, তদুপযুক্ত মনোবৃত্তি গঠন করিতে হইবে। এই মনোবৃত্তির সাহায্যে নিজের মধ্যে কার্য্যসিদ্ধির উপযোগী ক্ষমতা ও গুণাবলীর সৃষ্টি হয় এবং স্বভাবতঃ সমগুণী ব্যক্তিকে নিজের দিকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। এইরূপে প্রকৃতির আকর্ষণী-নীতির সহায়তা লাভ করা যায়।

এতদুদ্দেশ্যে অবশ্য মন হইতে ভয় এবং দুশ্চিন্তা দূর করিতে হইবে।

নিজের ক্ষমতায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে।

আপনার অভ্যন্তরস্থ সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করিতে হইবে। তাহার পন্থাও আমি যথাসাধ্য নির্দ্দেশ করিয়াছি।

মনে উচ্চাভিলাষ জন্মাইতে হইবে এবং কিরূপে উহা সম্ভবপর, তাহাও আমি বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়াছি।

আকাঙ্ক্ষা মানুষকে কার্য্যে উদ্বুদ্ধ করে এবং মনে ইচ্ছাশক্তি সৃজন করিয়া থাকে। সুতরাং একেবারেই নিরাকাঙ্ক্ষ না হইয়া বরঞ্চ উহাকে উপযুক্ত প্রণালীতে পরিচালিত করাই যুক্তিযুক্ত।

মনে প্রবল ইচ্ছাশক্তির সৃজন করিতে হইবে; কারণ এই ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে জগতের যে কোন দুষ্কর কার্য্য সম্পন্ন করা যায়।

একটু বিবেচনা করিলেই দেখা যায় যে, এই সকল উপদেশ এবং বিধি-নিয়ম কার্য্যকরী করিতে হইলে, আরব্ধ কার্য্যে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়া মগ্ন হইয়া থাকিতে হইবে।

প্রশ্ন উঠিতে পারে কিরূপে এই চেষ্টা ফলবতী করা

যায় ? এই সমস্যার সমাধান কল্পে পরবর্ত্তী কয়েকটি অধ্যায় বিনিয়োগ করা গেল, কারণ এই বিষয়ের যথোপযুক্ত আলোচনার উপর সমস্ত উপদেশের সাফল্য নির্ভর করে।

প্রথমেই এই সম্পর্কে স্বাভিভাব (Auto-Suggestion) সম্বন্ধে কিছু বলা কর্ত্তব্য। এই বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে হইলে, প্রথমেই জানা উচিৎ যে, গত কয়েক বৎসর ধরিয়া বিজ্ঞান-জগতে এই সম্পর্কে একটা গভীর ও ব্যাপক গবেষণা এবং বিরাট আন্দোলন চলিতেছে।

অভিভাব সম্বন্ধে মনস্তত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণের ধারণা এই যে, ইহা মনের উপর বাহ্যিক কোন কিছুর প্রতিচ্ছবি অঙ্কন-প্রণালী। নিজের মন হইতে উদ্ভূত চিন্তা নিজের উপর এইরূপে পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিলে উহাই স্বাভিভাব। বিষয়টি সহজ করিবার জন্য একটি উপমার সাহায্য লওয়া যাউক। মনে করুন, মন যেন মোমের মত কোন কোমল পদার্থ আর অভিভাব মুদ্রন-গুটিকা।

আপনারা ইহা হুবহু লক্ষ্য করিয়াছেন যে, সাঙ্কেতিক প্রণালীতে লোকের মন এমন প্রবল ভাবে প্রভাবান্বিত কারা যায় যে, সে যেন আপনারই ভাব-ধারণার অনুরূপ

এক ব্যক্তিত্ব লাভ করে। অভিভাব প্রয়োগ সম্বন্ধে বিশেষ কোনও বাঁধা-বাঁধি নিয়ম নাই। বাক্যগুলি এমন ভাবে প্রয়োগ করিতে হয়, যেন যাহার উপর ঐগুলি প্রযুক্ত হইল, সে বিনা যুক্তিতেই উহাদিগকে গ্রহণ করিতে পারে। আমরা অপরের আন্তরিকতা, আচার, ব্যবহার, মনোগত ভাব, পোষাক-পরিচ্ছদ, আরও কত কি দেখিয়া তাহাদের ভাব, বৈশিষ্ট্য রূপ মনে মনে অঙ্কিত করি এবং তদনুসারে কাহারও প্রতি আকৃষ্ট হই! এই সকল ব্যাপারে মূলতত্ত্ব এক। আমরা উহাদের নিকট হইতে এক একটি অভিভাব পাইয়া থাকি। এই প্রক্রিয়া নিম্নোক্ত প্রণালীতে নিষ্পন্ন হয়—

সর্ব্বদা নিজের মনের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিতে হইবে "আমি যাহা বলি তাহা সম্পূর্ণ রূপে বিকাশ করি, আমি ইহা করিতে সক্ষম, আমি ইহা নিশ্চয়ই করিব"... ইত্যাদি। আপনারা বোধ হয় সকলেই জানেন যে, এমন কি কোনও অলীক ঘটনা বারংবার শুনিলে ঐ বিষয়ে একটা বদ্ধমূল ধারণা জন্মিয়া থাকে এবং আমরা উহা বিশ্বাস করিতে যেন স্বভাবতঃই বাধ্য হই। কেহ কেহ হয়ত সম্পূর্ণ এক কৃত্রিম চরিত্রের বার বার অভিনয় করিবার ফলে শেষে নিজেকে ঐ চরিত্র অনুযায়ী গড়িয়া তোলে। আজকাল

এমন অনেক লোক দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা ঐরূপ ধার-করা ব্যক্তিত্ব লইয়া অপরকে প্রতারিত করে এবং এমন কি নিজেও শেষে প্রতারিত হয়। এই সকল যদি সত্য হয়, তাহা হইলে অভিভাব-সাহায্যে চরিত্রে কতকগুলি কার্য্য-সিদ্ধি-সহায়ক গুণ যে আহরণ করা যায়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সকলেই নিজ নিজ অভাব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত। উহাদিগকে পূরণ করিবার অন্যতম উপযুক্ত পন্থা হইল স্বাভিভাব।

অনেকে "আমার শক্তি-সামর্থ্য আছে; আমার উচ্চাভিলাষ আছে"—স্বাভিভাব-প্রয়োগ সম্বন্ধে এই মাত্র প্রণালী অবলম্বন করিয়া থাকেন; কিন্তু মনস্তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ এই বিষয়ে আরও প্রস্তাব করেন যে, যে বস্তু বা ক্রিয়ার সংস্রবে অভিভাব প্রয়োগ করিবার বাসনা থাকে, তাহা দস্তুর-মত আকাঙ্ক্ষা ও ইচ্ছা-শক্তি প্রয়োগে একান্তভাবে মনে মনে বারংবার মহালা দিতে হইবে।

এই প্রক্রিয়া হয়ত সময় সময় নেহাৎ আজগুবি বলিয়াই প্রতীয়মান হয়, কিন্তু ইহার মূলে এক নির্ভুল মনস্তত্ত্ব নিহিত আছে। সর্ব্বদা মনে রাখিবে যে, চরিত্রে বিশেষ কোনও গুণারোপ করিতে হইলে, ঐ বিষয় সকল

সময় অনন্যমনে চিন্তা করিতে হয় ; ভাবিতে হয় যেন আমি বাস্তবিকই ঐ গুণসম্পন্ন হইয়াছি, এবং মনে মনে উহার অভিনয় করিতে হয়। তাহা হইলে ক্রমে ঐ গুণ চরিত্রে নিবদ্ধ হইয়া যাইবে। মনোজগতের ইহা এক বিশেষ নিয়ম।

ধরিয়া লইলাম, তোমার কোনও উচ্চাভিলাষ নাই ; কিন্তু কিরূপে উহা জন্মান যায় ? নিম্নোক্ত প্রণালীতে এই বিষয় সম্ভব হইতে পারে। মনের মধ্যে সকল সময় ধারণা করিবে—"আমি উচ্চাভিলাষী, আমার প্রবল উচ্চাভিলাষ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে ; আমার অভি-লাষ পুরণ করিবার উপযুক্ত শক্তি আমার অবশ্যই আছে···" ইত্যাদি। উচ্চাকাঙ্ক্ষ ব্যক্তির প্রতিকৃতি হৃদয়ে অঙ্কিত কর। মনে কর,জগতের অপরাপর উচ্চাকাঙ্ক্ষ ব্যক্তিবর্গের তুমিও অন্যতম। তাহাদের ভাব-চিন্তা-ব্যবহার, আদব-কায়দার অনুকরণ করিতে চেষ্টা কর। তাই বলিয়া তাহাদের বাহ্যিক আচারও উৎকট ভাব-ভঙ্গির অনুকরণ করার কথা আমি বলিতেছি না, শুধু তাহাদের গুণাবলী গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। তাহাদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি এরূপ ভাবে অনুশীলন করিতে হইবে, যাহার ফলে তাহার উচ্চাভিলাষ এবং তজ্জনিত মনোবৃত্তিগুলি তুমি গ্রহণ

করিতে সক্ষম হও এবং তাহা দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া তদনুসারিত কার্য্য-কলাপে তোমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা জন্মে। তারপর কাজ আরম্ভ করিলেই হইল!

মনের স্বাভিভাব-গুণে যে কোনো দোষ-গুণ ও দুষ্কর কার্য্য করিবার উপযুক্ত শক্তি-প্রেরণা সহজে আয়ত্ত করা যায়। ইহা শুধু কথার কথা নহে, পরন্তু বিজ্ঞান-সম্মোদিত। এইরূপে অনেকে জীবনে উন্নতি লাভ করিয়াছেন এবং বর্ত্তমান যুগে বহু উচ্চাভিলাষী ব্যক্তিগণ অর্থব্যয়ে এই প্রণালী শিক্ষা করিতেছেন। আশা করি, পাঠক-পাঠিকাগণও এ বিষয়ে উদাসীন থাকিবেন না।

দশম অধ্যায়

সার্ব্বজনীন সুসঙ্গতি

প্রকৃতির ব্যক্ত এবং অব্যক্ত যাহা কিছু, সকল বস্তুই এক ঐক্য-সূত্রে আবদ্ধ। অণু-পরমাণু হইতে আরম্ভ করিয়া, দৃশ্যমান জগতের সর্ব্বত্রই এক অবিশ্রান্ত শব্দ-তরঙ্গের খেলা! সঙ্গীত যেরূপ লয়-তান-সমন্বিত, সেইরূপ প্রকৃতির সকল কর্ম্মেই একটা সুন্দর শৃঙ্খলা আছে। গ্রহ-তারকারাজীর নিজ নিজ কক্ষে ভ্রমণকালে যে শব্দ উত্থিত হয়, তাহার মধ্যেও এক সুমধুর সামঞ্জস্য বিদ্যমান। এইরূপ কি বক্ষের স্পন্দন, কি জলপ্রবাহের উত্থান-পতন, কি সুদূর সূর্য্য কিংবা নক্ষত্রলোক হইতে আলোকরশ্মির আগমন, প্রত্যেক ব্যাপারেই ঐ একতার স্পন্দন পরিলক্ষিত হয় এবং বৈজ্ঞানিক যন্ত্র-সাহায্যে অতি সহজেই এই সকল গ্রহণ ও পরিমাপ করা যায়।

সঙ্গীত-তরঙ্গের অদ্ভুত ক্রিয়া আপনারা সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন। এমনও হয়ত শুনিয়া থাকিবেন যে, বাদ্য-যন্ত্রোত্থিত অবিশ্রান্ত শব্দ-তরঙ্গের অভিঘাতে বিশালকায়

সেতু পর্য্যন্ত ধ্বসিয়া পড়ে। ইহা বিশ্বাসযোগ্য না হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবিকই এইরূপে প্রথমতঃ মৃদুকম্পন উপস্থিত হয়। তৎপরে উহা সজোরে দুলিতে থাকে। অবশেষে কম্পন এত প্রবল হয় যে, সমস্ত সেতুটিই সবেগে ভাঙ্গিয়া পড়ে। অনেকের ধারণা এই যে, যদি কেহ গগনস্পর্শী অট্টালিকার গঠন-কৌশল নির্ণয় করিয়া, কোন সুবৃহৎ বাদ্যযন্ত্র-সাহায্যে উপযুক্ত শব্দতরঙ্গ উত্থিত করিতে পারে, যাহা অট্টালিকায় সংক্রমিত হইয়া উহার মধ্যে প্রবল কম্পন জন্মাইতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে অনায়াসেই উহাকে ভূমিসাৎ করা যায়। এই শব্দতরঙ্গ সংক্রমণের উপর সমস্ত নির্ভর করে। আমরা যদি প্রকৃতির এই নৃত্য-তালের সহিত নিজেকে ঐক্য-সূত্রে আবদ্ধ করিতে পারি, তাহা হইলে জগতে এমন কিছুই নাই, যাহা আমাদের পক্ষে অসম্ভব।

এইরূপ উক্তি বাতুলের প্রলাপ নহে। বাস্তবিক মানব-মন এরূপ ভাবে গঠিত যে, উহাও প্রকৃতির তালে তাল রাখিয়া চলে। অবস্থা অনুযায়ী বিশ্ব-প্রকৃতি ও মানব-মনের মধ্যে সুর-সমন্বয় করিতে পারিলে, যে প্রবল শক্তি উৎপন্ন হয়, তাহার গতি কিছুতেই রুদ্ধ করা যায় না। ইহা সমষ্টি ও ব্যষ্টির পক্ষে সমভাবে

প্রযোজ্য। যদি আমরা বাহিরের কোলাহল হইতে নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া, কিয়ৎকালের জন্য মনকে অন্তর্মুখী করিতে পারি—তাহা হইলে মন ও প্রকৃতির সুসঙ্গতি উপলব্ধি করিতে পারি এবং আপন শক্তির উৎকর্ষ-লাভে সমর্থ হই।

বর্ত্তমান ব্যবসায়ী-সমাজ এই নীতির সারবত্তা বহুল পরিমাণে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। প্রমাণস্বরূপ আমরা দেখিতে পাই যে, তাঁহারা প্রত্যহ দিবারাত্রের মধ্যে কিছু সময় রুদ্ধদ্বারে নিভৃত কক্ষে, নিজেকে বাহিরের সমস্ত কোলাহল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, স্ব স্ব ব্যবসায়ের উন্নতি-বিধান সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া থাকেন। এই সময় তাঁহারা বাহিরের সমস্ত আকর্ষণ ভুলিয়া যান। তাঁহাদের এই মনস্তত্ত্ব বিশেষ কোনও জ্ঞানাতীত বিষয় নহে। ইহা নিতান্ত পরীক্ষিত সত্য এবং ইহার সাহায্যে অনেকে জীবনে উন্নতি লাভ করিয়াছেন।

নিভৃত চিন্তার অপরিসীম শক্তি। যাঁহার মনে কোনও উচ্চাভিলাষ আছে, তিনি যেন অবশ্যই দিনের মধ্যে অন্ততঃ কিছুকাল নির্জ্জনে আত্মচিন্তায় নিমগ্ন থাকেন এবং প্রকৃতির সুসঙ্গতির সহিত নিজের মনকে সংবদ্ধ করিতে চেষ্টা করেন। ফলে তাঁহার শক্তি ও উদ্যম

উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইবে। এই নিভৃত মুহূর্ত্তে আমাদের মন বাহিরের কোলাহল হইতে মুক্ত হইয়া অন্তঃপ্রবিষ্ট হয় এবং নব কর্ম্ম-প্রেরণার আগমন-পথ প্রশস্ত করিয়া দেয়। পরে যখন আমরা আবার কার্য্যে প্রবৃত্ত হই, তখন ঐ সকল নূতন নূতন ভাব ও ধারণা ক্রমে ব্যক্ত হইতে থাকে।

প্রাকৃতিক সুসঙ্গতির সহায়তা লাভ করিতে হইলে, নিম্নোক্ত নিয়মাবলীর অনুসরণ করিতে হইবেঃ—প্রথমতঃ, মনকে প্রস্তুত করিতে হইবে। তোমার বাক্য-চিন্তাসমূহ শুদ্ধ, সংযত হওয়া চাই; এই প্রকারে মন মল-নির্ম্মুক্ত হইয়া জগতের মঙ্গল-সাধনের উপযোগী হয়। অন্তরে ঘৃণার ভাব পোষণ করিয়ো না, কখনও নিরুদ্যম হইয়ো না; যে সকল চিন্তা তোমাকে ধ্বংসের পথে লইয়া যায়, তাহা পরিত্যাগ কর। মনের সকল প্রকার দৈন্য ঘুচাইয়া দাও। উহাদের পরিবর্ত্তে মনে উদ্যম ও উৎসাহের সঞ্চার করিতে চেষ্টা কর। মানুষ যখন একই ভগবানের সন্তান, তখন অবস্থা-বৈষম্য ঘুচাইবার পন্থা তোমার সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন।

প্রতিদিন মধ্যাহ্নে কিংবা সন্ধ্যা-সকালে যখনই পারি-পার্শ্বিক অবস্থা অনুকূল বলিয়া মনে করিবে, তখনই গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া কিছুকাল মৌনাবস্থায় অবস্থান করিবে;

ঐ সময় কেহ যেন বাধা-বিঘ্ন না জন্মায়। এই সময় সমস্ত দেহ-মনকে বিরাম দেওয়া কর্ত্তব্য। প্রত্যেক মাংসপেশী, প্রত্যেক স্নায়ু শিথিল করিয়া কয়েকবার সজোরে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ-বর্জ্জন করিবে। ইহাতে তোমার সকল শ্রান্তি দূর হইয়া যাইবে। সমস্ত দুর্ভাবনা দূর করিয়া, এইরূপ প্রশান্ত মনে কিছুকাল অবস্থান করিতে পারিলে, দেখিবে, তুমি যেন প্রকৃতির সহিত একাত্ম হইয়া গিয়াছ ; তখন তোমার মনে কি এক অপূর্ব্ব সুখ ও স্বস্তি অনুভূত হইবে। তোমার চিন্তার ধারা সেই সার্ব্বজনীন সুসঙ্গতির মধ্যে বহিতে থাকিবে এবং সেই সুসঙ্গতির সহিত ঐক্যবদ্ধ হইয়া তোমার মনে এক অপরিসীম শান্তি ও অনন্ত শক্তির আবির্ভাব হইবে। কিছুক্ষণ পরে তোমার নূতন উদ্যম ও ক্ষমতার সঞ্চার হইবে এবং কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া কত নূতন প্রেরণা উপলব্ধি করিবে। যতই ইহার অনুশীলন করিবে, ততই তোমার ভিতরের প্রবুপ্ত অজ্ঞাত শক্তির বিকাশ হইয়া কাল-বৈশাখীর মেঘের ন্যায় প্রচণ্ড আকার ধারণ করিবে। বিশ্বাস ও প্রজ্ঞার সহিত এই শক্তিকে উপযুক্ত প্রণালীতে পরিচালিত করিলে, শুধু অর্থ কেন—ব্রহ্মাণ্ড বিজয় করা তোমার পক্ষে সহজসাধ্য হইয়া পড়িবে।

একাদশ অধ্যায়

উদ্ভাবনী-শক্তি

মানুষের আর্থিক তথা সকল প্রকার উন্নতির মূলেই নূতন কিছু সৃষ্টির প্রয়াস বর্ত্তমান। বাস্তবিক মানব-মনে এই সৃষ্টির অভিলাষ এবং তদুপযোগী শক্তি নিহিত না থাকিলে আজ আমরা আমাদের চতুর্দ্দিকে যে সকল ভোগবিলাসের সামগ্রী দেখিতে পাই, তাহাদের অতি অল্প-সংখ্যকই বর্ত্তমান আকারে পাওয়া সম্ভবপর হইত। সাড়া কিংবা বালীর সেতু আজ জগতের মধ্যে অতি বিস্ময়ের বস্তু! কিন্তু উহা নির্ম্মাণের পূর্ব্বে উহার প্রত্যেকটি খিলানের আকার ও প্রসার, উহার প্রত্যেকটি লৌহ-স্তম্ভের আকৃতি, গঠন ও সংস্থাপন—এক কথায় বলিতে গেলে, সমস্ত সেতুটির প্রতিকৃতিই নির্ম্মাতার মনে বর্ত্তমান ছিল; শেষে উহা কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। ব্যবসায়-কেন্দ্রে যে সকল সুবৃহৎ অট্টালিকা সগর্ব্বে মস্তক উত্তোলন করিয়া দর্শকের মনে যুগপৎ আনন্দ ও বিস্ময়ের সঞ্চার করে, উহারাও নির্ম্মিত হইবার পূর্ব্বে

তাহাদের সর্ব্বাঙ্গীন সৌন্দর্য্য ও সৌষ্ঠব লইয়া, স্থপতির মনে বিরাজ করিত।

আজ যে ঘটিকা-যন্ত্রের সাহায্যে মানুষ তাহার সমস্ত কার্য্য নিয়ন্ত্রণ করে এবং সময়-নিষ্ঠার ফলে কর্ম্মক্লান্তি বিদূরিত করিয়া, মনের সন্তোষ এবং দেহের স্বাস্থ্য লাভ করিতে সমর্থ হয়, তাহার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিকল্পনা—প্রথমে মানুষের মনেই উদিত হইয়াছিল। ঐ ঘটিকা নির্ম্মাণ কখনই সম্ভবপর হইত না, যদি না উহার রচনা-কৌশল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নির্ম্মাতার মনে পূর্ব্বেই প্রকটিত হইত। এইরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। কিন্তু জনসাধারণ বস্তু-জগতের মূল কারণ নির্ণয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। তাঁহারা কদাপি লক্ষ্য করিতে চেষ্টা করেন না যে, প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তুই আদিতে স্রষ্টার মনে রূপ পরিগ্রহ করিয়া থাকে। ইহাই সকল সৃষ্টির সনাতন নিয়ম। আবাস-গৃহ, পোষাক-পরিচ্ছদ, ছুরি, কাঁচি, কল-কব্জা প্রভৃতি যাহা কিছু সৃষ্ট পদার্থ আমরা দেখিতে পাই, ইহাদের প্রথম সৃষ্টি কিন্তু স্রষ্টার মস্তিষ্কে বা মনে।

নূতনের রূপ কোন মানস-পটকে আশ্রয় করিয়াই অভিব্যক্ত হয়। ব্রহ্মার মানস-পুত্রের মত মানুষের প্রথম সৃষ্টি মনেই। অর্থোপার্জ্জন ও পার্থিব অন্যান্য বস্তুর লাভা-

লাভ এই নিয়মের অধীন। যে ব্যক্তি অদূর-ভবিষ্যতে প্রাপ্য অতি অল্পের আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহার প্রাপ্তিও ঐ পরিমাণেই হইয়া থাকে। আবার যাঁহারা সমগ্র বিষয়টির একটা সাধারণ ধারণা করিয়া লইতে পারেন, তাঁহারা কার্য্যে অগ্রসর হইবার সঙ্গে সঙ্গে উহার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পূর্ণ করিয়া, যথাসময়ে উহার একটা অখণ্ড অবয়ব দান করিতে সমর্থ হন্।

বোষ্টন সহরের প্রসিদ্ধ ধনী টমাস লসন্ সম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, তিনি যৌবনের প্রারম্ভেই তাঁহার ভবিষ্যৎ কর্ম্মক্ষেত্রের ছবি নিজের মনে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি কল্পনা করিলেন যে, তিনি এক বিস্তৃত ভূখণ্ডের মালিক হইবেন এবং ঐ স্থানে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অশ্ব এবং গো-মহিষাদি পালন করিয়া, প্রভূত অর্থের অধিকারী হইবেন। শেষে শিল্প এবং অন্যান্য নানারূপ দ্রব্যসম্ভার পরিপূর্ণ একখানি গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া, ঐ স্থানে তাঁহার আদর্শ জীবন যাপন করিবেন। পরবর্ত্তী জীবনে তিনি বলিয়াছেন যে, এই গৃহ-নির্ম্মাণের উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহার কর্ম্মপদ্ধতি এরূপ-ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিলেন যে, ভূমি ও তৎসংক্রান্ত যাবতীয় দ্রব্য ক্রয় করিবার জন্য অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা

ঠিক যেন চিত্রের বাহ্যরেখার মধ্যে রঙ্ ফলানর মতই হইয়াছিল। চিত্রের নক্সা মুহূর্ত্তের তরে তাঁহার মন হইতে বিদূরিত হয় নাই।

আমাদের দেশের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী এবং কর্ম্মবীর সার রাজেন মুখার্জ্জির জীবনেও এই সত্য পরিলক্ষিত হয়। কর্ম্ম-জীবনের সূত্রপাতেই তিনি তাঁহার অন্তরের সৃজন-প্রতিভার অফুরন্ত প্রেরণা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। আত্মোন্নতির একটি স্পষ্ট মানচিত্র মানসপটে অঙ্কিত করিয়া, তিনি পূর্ণোদ্দমে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

যে-কোনও বিষয়ে উন্নতি করিতে হইলেই চাই জীবনে একটা আদর্শ। ঐ আদর্শকে মূর্ত্ত করিবার প্রচেষ্টা সফল হইলেই একটা নব অবদানের সৃষ্টি হয়। অর্থাকাঙ্ক্ষা করিলে অর্থের ছবি মনে অঙ্কিত করিতে হইবে; ভাবিতে হইবে—উহা সদুপায়ে উপার্জ্জন করা আমার সম্পূর্ণ বৈধ অধিকার এবং আমি ক্রমশঃ উহার পরিমাণ বর্দ্ধিত করিব। আমি উহা ইচ্ছামত ব্যবহার করিতে পারি। এইরূপে ধনীর সমস্ত মনোবৃত্তি নিজের মনে অভিনয় করিতে হইবে এবং অবশেষে উহাকে মূর্ত্ত করিবার বিধিমত চেষ্টা করিতে হইবে।

আচ্ছা, একবার ভাবিয়া দেখুন দেখি, যদি স্থপতি

কিংবা ঘড়ি-নির্ম্মাতার মনে তাহাদের নিজ নিজ সৃষ্ট পদার্থের প্রতিকৃতি পূর্ব্বেই অঙ্কিত না হইত, তাহা হইলে উহা কি আকার ধারণ করিত?—শুধু সৌন্দর্য্য-বিহীন একটা দ্রব্যস্তূপ, যাহার কোনও ব্যবহারিক মূল্যই নাই!

সাধারণ লোকের পক্ষে এইরূপ ব্যাপারই ঘটিয়া থাকে। তাঁহারা হয়ত গৃহকোণে বসিয়া বলিতে থাকেন, "আমি অর্থ চাই", কিন্তু ওই পর্য্যন্তই। তাঁহাদের মনে কোনরূপ অর্থোপার্জ্জন-প্রচেষ্টার স্পষ্ট আদর্শ নাই। তাঁহারা কল্পনা-সাহায্যে অর্থকরী মনোবৃত্তি গঠন করিতে অনিচ্ছুক বা উদাসীন। কাষ্ঠস্তূপ-সংগ্রহচিকীর্ষু ব্যক্তি তাহার ইচ্ছা বাস্তবে পরিণত করিতে চাহিলে, পূর্ব্বেই তদুপযুক্ত ভূমি এবং উহার প্রসার ও উচ্চতা সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করিয়া লয়; শেষে ধীরে ধীরে কাষ্ঠাহরণ করিয়া যথোপযুক্ত স্থানে সন্নিবেশ করিতে থাকে; শুধু একবার ঐরূপ বাসনা করিয়াই নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকে না।

ঈপ্সিত বস্তু লাভ করিতে হইলে, মনের মধ্যে উহার একটা প্রতিকৃতি অঙ্কিত কর এবং স্থিরচিত্তে আপন লক্ষ্য অনুসরণ করিয়া চলিতে থাক। তোমার কাল্পনিক মূর্ত্তিকে

অবয়ব পরিগ্রহ করাইতে হইলে, উহার প্রত্যেক সূক্ষ্মাংশটি আয়ত্ব করিবার জন্য যত্নবান হও। জগতে যাঁহারা যশের অধিকারী হইয়াছেন, ইহাই তাঁহাদের কর্ম্মসাফল্যের গূঢ়তত্ত্ব। অর্থোন্নতির মূলেও এইরূপ পরিকল্পনা বিরাজমান।

দ্বাদশ অধ্যায়

মনের একাগ্রতা

আমরা মনের একাগ্রতা সম্বন্ধে অনেক কিছু বলিয়া এবং শুনিয়া থাকি, কথায় কথায় এই শব্দ ব্যবহারও করি। কিন্তু প্রায়শঃ ইহার অর্থ সম্যক উপলব্ধি করিতে পারি না। বর্ত্তমানে এই সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব এবং ইহার তাৎপর্য্য নির্ণয় করিয়া, উহাকে আমাদের কার্য্যোপযোগী করিতে প্রয়াস পাইব।

প্রথমতঃ, একাগ্রতা কাহাকে বলে? অভিধানে ইহার যে অর্থ পাওয়া যায়, তাহা হইতে আমরা বুঝি যে, মনের বিভিন্ন বৃত্তিগুলিকে সমকেন্দ্রীভূত করার প্রচেষ্টাই একাগ্রতা সাধন। উহাতে কর্ম্ম-ক্ষমতা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। ইহাই একাগ্রতার তাৎপর্য্য।

একটি দৃষ্টান্ত-সাহায্যে জিনিষটি আরও স্পষ্টরূপে বুঝান যায়। আপনারা হয়ত আতসী কাঁচ (Sun glass) দেখিয়া থাকিবেন। এই কাঁচের সাহায্যে সূর্য্যালোককে এমনভাবে কেন্দ্রীভূত করা যায় যে, উহার উত্তাপে যে-কোন জিনিষে অতি সহজেই অগ্নি-সংযোগ করা যায়।

কোন দ্রব্য পাইবার বাসনা জন্মিলে, যদি আমরা একাগ্রমনে উহার জন্য চেষ্টা না করি, তাহা হইলে উহা প্রাপ্তির আশা সুদূর-পরাহত। প্রথমতঃ মনে মনে বাঞ্ছিত দ্রব্যের একটি প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিতে হইবে। তৎপরে উহার জন্য মনে যথাশক্তি প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করিতে হইবে। অবশেষে ইচ্ছা-শক্তি এবং মনোযোগের সাহায্যে ক্রমেই উহা হস্তগত হইবার সম্ভাবনা। আমাদের শক্তি এবং কামনাকে ঠিক আতসী কাঁচের অধিশ্রয়ণ-(focus) বিন্দুতে সূর্য্যালোক সংগ্রহ করার মতই কেন্দ্রীভূত করিতে হইবে। যাহা চাই তাহার জন্য সমগ্র শক্তি নিয়োগ করিতে হইবে; দিনের পর দিন লক্ষ্য উদ্দেশ করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে, এবং যে পর্য্যন্ত না উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, সে পর্য্যন্ত বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলে চলিবে না।

প্রায়শঃ লোকের একাগ্রতা সম্বন্ধে বিশেষ কোনও ধারণা নাই। তাঁহারা ঠিক যেন বালসুলভ চপলতা বশতঃই সম্মুখে যাহা পাওয়া যায়, তাহা একবার স্পর্শ করিয়া, আবার পর মূহূর্ত্তেই পরিত্যাগ করেন; তাঁহাদের যে কি অভাব, তাহা তাঁহারা বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। ক্রমান্বয়ে এইরূপ করিবার ফলে তাঁহাদের শক্তির যথেষ্ট অপচয় হয়।

অতি সামান্য বিষয়েও মনের একাগ্রতা সাধন করা

উচিত। এইরূপ অভ্যাসের ফলে মানসিক শক্তি বৰ্দ্ধিত হয় এবং মানুষ মহত্তর কার্য্যের জন্য প্রস্তুত হইতে পারে। এক সময় শুধু একটি কার্য্যেই ব্যাপৃত থাকা উচিত। জগতের যাঁহারা শ্রেষ্ঠ কৰ্ম্মী, তাঁহারা প্রায়ই দেখা যায় যে, কোন কার্য্য করিবার সময় উহাতেই নিমগ্ন হইয়া থাকেন।

মনকে সংযত করিবার প্রচেষ্টা একাগ্রতা-অৰ্জ্জনের প্রথম স্তর। প্রতিনিয়ত মনকে একই বিষয়ে নিবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিলে, মনের সমস্ত বৃত্তিগুলি উহার দিকে ধাবিত হয় এবং নূতন নূতন ভাব ও কল্পনা জাগ্রত হইয়া একটি বিশেষ কেন্দ্রে আসিয়া সম্মিলিত হয়। পক্ষান্তরে প্রকৃতির আকর্ষণী-নীতির বলে কেন্দ্রস্থ শক্তিসমূহ আরও দৃঢ়ীভূত হয়। এইরূপে শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করিতে না পারিলে, উহা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া কার্য্যোপযোগিতা-শক্তি হারাইয়া ফেলে।

প্রতি কৰ্ম্মে প্রত্যেকেরই মনের একাগ্রতা সাধন করা কৰ্ত্তব্য। কোন এক সময় বিশেষ কোন একটি কার্য্য সম্পন্ন করিতে চেষ্টা করিবে এবং মনকে উহাতেই আবদ্ধ করিয়া রাখিবে। অন্য কিছুর চিন্তা যেন তোমার মনে উদিত না হয়। ঐ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেলে, কার্য্যান্তর

গ্রহণ করিবে। কার্য্যকালে তোমার চিন্তা ও চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে একমুখী হওয়া চাই।

কোন এক বিশেষজ্ঞের মতে—"একই সময়ে একটি কার্য্যে নিযুক্ত থাকাই নিতান্ত প্রশস্ত! ঐ সময় মন যেন অপর কোনও বিষয়ের চিন্তায় বিচলিত না হয়।" অপর একজন বিশেষজ্ঞ বলিয়াছেন, "আমাদের জীবনে বারংবার ব্যর্থতার কারণ—আমাদের যথেষ্ট মনোযোগের অভাব এবং একই সময়ে বহু বিষয়ের চিন্তা।" আর একজন বলিয়াছেন, তিনি যে সকল কার্য্য অতি সহজেই সম্পন্ন করিতে পারিতেন, তাহার কারণ—তিনি কার্য্যকালে অন্য কিছুর চিন্তা করিতেন না। যখন অর্থোপার্জ্জন করিবার সময় তখন তিনি শুধু অর্থের কথাই ভাবিতেন। তখন নিজের পোষাক-পরিচ্ছদের পারিপাট্য কিংবা স্ত্রীর বস্ত্রালঙ্কারের, কথা তাঁহার মনে একবারও স্থান পাইত না।

যশস্বী চেষ্টারফিল্ড (Lord Chesterfield) বলিয়া গিয়াছেন, দিনের মধ্যে কোন কার্য্যের জন্যই সময়ের অভাব হয় না, যদি একবার এই কথা স্মরণ থাকে যে, যে-কার্য্যেই হস্তক্ষেপ করি না কেন, উহা নিষ্পন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত অন্য কিছুরই চিন্তা করিব না। পক্ষান্তরে একই সময় অনেক কিছু ভাবিতে বা করিতে গেলে গোটা

বৎসরেও যথেষ্ট সময় মিলিবে না। অবস্থা তখন দুই নৌকায় পা দেওয়ার মতই হয়।

একাগ্রতা সম্বন্ধে নিম্নোক্ত বাক্যাবলী বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য। যে বিষয়ের সঙ্গে নিজের স্বার্থ জড়িত কিংবা যাহার উপর প্রগাঢ় অনুরাগ আছে, তাহাতে অতি সহজেই মনঃসংযোগ করা যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখা যায় যে, প্রিয় পাত্রের চিন্তা প্রায় সর্ব্বক্ষণের জন্যই মনকে জুড়িয়া বসিয়া আছে; মানস-পটে তাহার চিত্র যেন চিরতরে অঙ্কিত। এমন কি কর্ম্ম-সময়েও চিন্তাস্রোত মাঝে মাঝে তাহার প্রতি ধাবিত হয় এবং সময় সময় ভাবী মিলনের কল্পনা মনকে আবেগ-চঞ্চল করিয়া তোলে। সন্তানের প্রতি মমতা লোকের মন হইতে কখনও অপসারিত হয় না; পুত্র কার্য্য-ব্যপদেশে বিদেশে গেলে মায়ের প্রাণ তাহার জন্য আন্‌চান্‌ করিতে থাকে। ঠিক হংসী যেমন নিজ সন্তানের জন্য নিতান্ত মমতা-পরবশ হইয়া জলে সাঁতার কাটে, সেইরূপে আমরা সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেই দেখিতে পাই যে, প্রত্যেকেরই কোন-না-কোন প্রীতি বা আসক্তির বস্তু আছে এবং উহা সকল সময়ের জন্যই তাহার মনের অতি কাছাকাছিই থাকে। কর্ম্ম-শক্তিকেও ঠিক এইরূপ সহজ করিতে হইবে। প্রীতি-

পাত্রের অব্যবহিত পরবর্ত্তী চিন্তা আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য এবং স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্যই হওয়া উচিত। কারণ আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করিতে পারিলে স্ত্রীর বস্ত্রালঙ্কার-ক্রয় পুত্রের শিক্ষা-বিধান কিংবা তাহাদের ভবিষ্যৎ সুখের জন্য জীবন-বীমা ইত্যাদির সংস্থাপন করা এবং বর্ত্তমানে যাহা কিছু নিতান্ত সুদুষ্প্রাপ্য বলিয়াই মনে হয়, তাহাও অতি সহজেই পাওয়া যায়।

আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করার উপর যখন তোমার জীবনের সুখ-শান্তি এতটা নির্ভর করে, তখন মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হও। মনকে কখনও উদাসীন কিংবা উচ্ছৃঙ্খল হইতে দিয়ো না, নিতান্ত নির্ব্বোধের ন্যায় অবাস্তবের চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়ো না। মনকে সংযত কর, আর্থিক স্বচ্ছলতার আদর্শ হৃদয়ে অঙ্কিত কর এবং দীর্ঘসূত্রতা পরিত্যাগ করিয়া, উহাকে কার্য্যে পরিণত করিতে সচেষ্ট হও।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

অধ্যবসায়

পূর্ব্ব অধ্যায়ে আমরা মনের একাগ্রতা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি এবং উহা অর্থোপার্জ্জনে কি পরিমাণে সহায়তা করে, তাহাও বিশেষভাবে বলা হইয়াছে। কিন্তু সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, এই একাগ্রতা মুহূর্ত্তকাল স্থায়ী হইলে চলিবে না; এক সময় হয়ত কোন একটি কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলাম, আবার পরমুহূর্ত্তেই তাহা পরিত্যাগ করিয়া কার্য্যান্তর গ্রহণ করিলাম। এইরূপ আচরণ অনেকটা প্রজাপতির পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে উড়িয়া যাওয়ার মতই। লক্ষ্য স্থির কর। তারপর ধীর স্থিরচিত্তে এবং অবিচলিত ভাবে সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করিয়া, উহার দিকে অগ্রসর হও।

এক সময় এক কাজ করাই যুক্তিযুক্ত। এই গুণের অভাবে এমন কি প্রবল প্রতিভাসম্পন্ন, নানা বিষয়ে কুশল এবং উদ্যোগী ব্যক্তিও অনেক সময় বিফল-মনোরথ হইতে বাধ্য। একবার কোন কাজে হাত দিলে, তাহা হইতে

মন যেন বিচ্যুত না হয়। মনুষ্য-সমাজে 'বুলডগে'র দৃঢ়তা সুবিদিত, ঠিক ঐরূপ অধ্যবসায়শীল হইতে হইবে। এই সম্পর্কে একটি ব্যাঘ্রের গল্প প্রচলিত আছে; সে একবার শিকারের সন্ধান পাইলে, তাহা হস্তগত না হওয়া পর্য্যন্ত দিনের পর দিন তাহার অনুসরণ করিত।

ডেনি বাকেট নামে উপকথার এক ব্যক্তি অধ্যবসায়ী বলিয়া এরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন যে, শীকারে গেলে, পরিদৃষ্ট কোনো জন্তুরই তাঁহার হস্ত হইতে অব্যাহতি ছিল না। একদিন তিনি জঙ্গলে গিয়া, একটি ভল্লুক দেখিতে পাইয়া, তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। ভল্লুক ক্রমাগত ছুটিয়া ছুটিয়া অবসন্ন হইয়া পরিশেষে প্রাণভয়ে তাড়াতাড়ি এক বৃক্ষের উপর উঠিয়া আত্মগোপন করিল। বাকেট্ কিছুতেই ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি খুঁজিতে খুঁজিতে সেই বৃক্ষের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বনের জীব-জন্তুগণ বাকেট্কে ভালরূপই চিনিত। তিনি বৃক্ষস্থিত ভল্লুককে লক্ষ্য করিয়া শর-সন্ধান করিবামাত্র সে অমনি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল,—"মহাশয়, শরক্ষেপ করিবেন না, আমি নিজেই নামিয়া ধরা দিতেছি।"…এমনি করিয়া অধ্যবসায়ীর নিকট কৃতকার্য্যতা আপনি আসিয়া ধরা দেয়!

আমরা সময় সময় এরূপ অনেক লোকের সংস্রবে আসি, যাহারা আমাদের পরম শত্রুতাচরণ করিলেও তাহাদের সঙ্কল্পের দৃঢ়তা এবং অদ্ভুত ইচ্ছাশক্তি দেখিয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া যাই। উহা তাহাদের অধ্যবসায়ের ফল। সূত্রধর যেমন কাজ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার যন্ত্র যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট রাখে না, অধ্যবসায়ী সেইরূপ ইচ্ছাশক্তি ও সঙ্কল্পকে ক্ষণেকের জন্য তাহার সাধনা হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে দেয় না।

মানুষ যত বড় ইচ্ছাশক্তি-সম্পন্নই হউক না কেন, তাহার অধ্যবসায় না থাকিলে, সে কোন অভীপ্সিত সুযোগ্য ফল লাভ করিতে পারে না। আকাঙ্ক্ষিত বস্তু না পাওয়া পর্য্যন্ত একাগ্রচিত্তে এবং অবিচলিত ভাবে সমগ্র শক্তি ঐ উদ্দেশ্যে নিয়োগ করিতে হইবে। এইরূপ কর্ম্মানুরক্তি সাময়িক দুই এক মুহূর্ত্তের জন্য হইলে চলিবে না। ফলপ্রাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত অধ্যবসায়ের দরকার।

জনৈক প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী বলিয়াছেন, "আমার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এবং তজ্জনিত অভিজ্ঞতার ফলে আমার এই ধারণা জন্মিয়াছে যে, জগতে ক্ষুদ্র ও মহতের, দুর্ব্বল ও সবলের প্রভেদ শুধু নির্ভর করে তাহাদের উদ্যম এবং সঙ্কল্পের তারতম্যের উপরে। মনে এইরূপ স্থিরসঙ্কল্প

কর যে "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন"। এই গুণ থাকিলে, জগতে একবার যাহা অপরের পক্ষে সম্ভবপর হইয়াছে, তুমিও তাহা করিতে পারিবে। প্রবল ধীশক্তি, অনুকূল অবস্থা এবং নানারূপ সুযোগ-সুবিধা সত্ত্বেও অনেকে অধ্যবসায়ের অভাবেই কোন বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারে না। অকৃতকার্য্য ব্যক্তি মনুষ্যত্বের গৌরবে বঞ্চিত এবং শেষ পর্য্যন্ত দ্বিপদবিশিষ্ট জন্তু বলিয়াই পরিগণিত হয়।

অপর একজন বলিয়াছেন, "দৃঢ় প্রতিজ্ঞাই মানুষের ব্যক্তিত্ব ফুটাইয়া তোলে। অযথা কোন অনির্দ্দিষ্টের সন্ধানে বাহির হইলে চলিবে না, লক্ষ্য ও সঙ্কল্প স্থির কর। প্রবল ইচ্ছাশক্তি জাগ্রত কর। তাহা হইলে সকল বাধা-বিঘ্ন তোমার পথ হইতে সরিয়া দাঁড়াইবে, ঠিক যেমন পথ-নিপতিত শীতের তুষার যুবকের দৃঢ় পদসঞ্চালনে অতি সহজেই বিক্ষিপ্ত হইয়া যায়। ইচ্ছাশক্তি এবং অধ্যবসায় মানুষকে অতিমানুষ করিয়া তোলে।"

প্রসিদ্ধ মন্ত্রী ডিস্‌রেলি বলিয়াছেন, "যথেষ্ট চিন্তার পর আমার এই ধারণা জন্মিয়াছে যে, জীবনে একবার লক্ষ্য স্থির করিয়া অগ্রসর হইতে পারিলে, উহা লাভ করাও যায়। যে ব্যক্তি জীবন-মরণ-পণ করিয়া কার্য্য-

ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়, তাহার পথে কোন বাধাই থাকে না।"

অপর এক ব্যবসায়ীর মতে "দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্খা এবং প্রবল ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে মানুষ অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তুলিতে পারে। এমন কি দৈবও দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছাশক্তির নিকট পরাভূত হয়; উহা আপাততঃ উন্নতির পরিপন্থী হইলেও শেষে অধ্যবসায়ের ফলে পরিপোষকতা করিয়া থাকে। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্যক্তি সকল বাধাবিমুক্ত এবং স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে সমর্থ।"

General Grant সম্বন্ধে আব্রাহাম লিঙ্কন বলিয়াছেন, "তাঁহার বৈশিষ্ট্য এই যে, উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তাঁহার প্রবল অধ্যবসায়। তিনি সহজে কিছুতেই বিচলিত হন না। তাঁহার ধৈর্য্য বুলডগের মতই; একবার কোন কাজে হাত দিলে, তাহা নিষ্পন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত কখনও তিনি তাহা হইতে বিরত হন না।"

এই উদ্ধৃত বাক্যাবলী পাঠ করিয়া অনেকে মনে করিতে পারেন যে, ইচ্ছাশক্তির উপরেই বেশী জোর দেওয়া হইয়াছে। অধ্যবসায়ের সহিত উহাদের কি ঘনিষ্ট সংস্রব থাকিতে পারে? কিন্তু একটু বিচার করিলেই বুঝিতে পারিবে যে, অধ্যবসায় ও ইচ্ছাশক্তি পরস্পরের

মুখাপেক্ষী ; অধ্যবসায় না থাকিলে ইচ্ছাশক্তি নিরর্থক উহা কোন কাজেই আসে না। ইচ্ছাশক্তি যন্ত্রস্বরূপ ; অধ্যবসায় উহার চালক এবং উহাকে যথাস্থানে সন্নিবেশ করিয়া থাকে।

যদি তোমার মধ্যে অধ্যবসায় গুণ না থাকে, তাহা হইলে কোন কার্য্যে বহুক্ষণ মনোনিবেশ করার চেষ্টা কর। এইরূপ অভ্যাসের ফলে মানসিক অবস্থার বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটে, মস্তিষ্কে যথোপযুক্ত কোষ-সমষ্টি সৃষ্ট হয় এবং চরিত্রে ঈপ্সিত গুণাবলী সন্নিবদ্ধ হইয়া যায়। দৈনন্দিন কার্য্যে অবিচলিত মনঃসংযোগ কর এবং যে পর্য্যন্ত না নিজেকে বাহিরের আকর্ষণ হইতে বিমুক্ত করিতে পার, সে পর্য্যন্ত ঐরূপ থাক। প্রতিনিয়ত এইরূপ চেষ্টার ফলে, তোমার মধ্যে অধ্যবসায় জন্মিয়া যাইবে।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

অভ্যাস

অভ্যাসের অপূর্ব্ব শক্তি। কিন্তু সাধারণতঃ লোকে ইহার অনেক কদর্থ করিয়া থাকে। কথায় বলে "মানুষ অভ্যাসের দাস।" অভ্যাস যেন শৃঙ্খল বিশেষ। প্রত্যহ আমরা উহাতে এক একটী আংটা সংযোগ করিয়া থাকি। শেষে উহা এরূপ শক্তিশালী হয় যে, উহাকে ছিন্ন করা একরূপ দুষ্কর। কিন্তু এই উক্তিতে মানুষের দাসত্বের দিকটাই বিশেষ ভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। অভ্যাসের আরও একটা দিক আছে, তাহাও বর্ত্তমানে আলোচ্য।

অভ্যাস যদি মানুষের উপর সর্ব্বেসর্ব্বা প্রভু হইয়া দাঁড়ায় এবং তাহার সমস্ত সদিচ্ছা এবং সৎপ্রবৃত্তিকে সংযত করে, তাহা হইলে মনুষ্যত্বের প্রাধান্য রহিল কোথায়? এই শক্তিকে কোন রূপে সংযত করা এবং প্রকৃতির অন্যান্য শক্তির ন্যায় ইচ্ছানুরূপ কার্য্যে নিয়োগ করা যায় কি না? তাহা হইলে মানুষকে অভ্যাসের দাসত্ব স্বীকার করিতে কিংবা উহার বিরুদ্ধে কোনরূপ অনুযোগ করিতে হয় না। বর্ত্তমানে মনস্তত্ত্ববিদ

পণ্ডিতগণ নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিয়াছেন যে, অভ্যাসকে এরূপ আয়ত্তাধীনে আনা যায় যে, উহা প্রভুত্বের পরিবর্ত্তে মানুষের দাসত্ব করিতেই বাধ্য হয়। এই তত্ত্ব অবগত হওয়ায় আজকাল বহুলোক অভ্যাসকে সুপথে পরিচালিত করিয়া নিজ নিজ প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এতদ্বারা যাহাতে কর্ম্ম-শক্তি বিনষ্ট এবং বিপথে পরিচালিত হইয়া, মানুষের যুগ-যুগান্তের চেষ্টা এবং ব্যয়লব্ধ কীর্ত্তি-কলাপ বিলুপ্ত করিতে না পারে এবং তাহার মনোরাজ্যে কোনরূপ উৎপাতের উদ্ভব না হয়, সেইরূপ সম্ভাবনার হাত হইতে তাহাকে নিষ্কৃতি দেয়।

অভ্যাস মনোরাজ্যে কর্ম্মের ভ্রমণ-পথ। আমাদের প্রত্যেক কর্ম্ম-প্রচেষ্টা মনের মধ্যে একটা চিরস্থায়ী চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া রাখে এবং ঐ পথকে পূর্ব্ব হইতে আরও প্রশস্ত ও সুগম করিয়া তোলে। ক্ষেত্রমধ্যে বিচরণ করিবার সময় আমরা বন্ধুর অজানা পথ পরিত্যাগ করিয়া, সরল সোজা রাস্তায়ই চলিয়া থাকি। মনের গতিও ঠিক তদনুরূপ। যে পথে সর্ব্বাপেক্ষা কম বাধা-বিঘ্ন এবং অনুক্ষণ কর্ম্ম-প্রবাহের চলাচল হইয়া থাকে, সেই পথেই মন অগ্রসর হয়। উপর্য্যুপরি একই কাজ করার ফলে অভ্যাস জন্মিয়া থাকে। চৈতন্য জগতের সর্ব্বত্রই উহা এক বিশেষ

নিয়মাধীন। এমন কি কাহারও কাহারও মতে—জড় জগতেও এই নিয়ম প্রচলিত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা দেখিতে পাই যে, একখণ্ড কাগজ একবার ভাঁজ করিলে, পুনরায় ভাঁজ করিবার সময় পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট রেখাতেই আবার ভাঁজ হইয়া থাকে। যাহারা করাত কিংবা তদনুরূপ কোনও যন্ত্র ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত, তাহারা বিশেষরূপে অবগত আছে—একবার যে পথে ঐ যন্ত্র চালিত হইয়াছে, পুনর্ব্যবহারের সময় উহা ঐ পথেই প্রবিষ্ট .হইবে। পোষাক-পরিচ্ছদ, করত্রাণ প্রভৃতি ব্যবহার-কালেও ব্যবহারকর্ত্তার উপযোগী এমন কতকগুলি দাগ পড়িয়া যায়, যাহা আর সহজে নষ্ট হয় না। নদীর গতিপথও এইরূপেই সুনির্দ্দিষ্ট হইয়া যায়।

কিরূপে অভ্যাস গঠন করা যায়? অবাঞ্ছনীয় পুরাতন অভ্যাস বর্জ্জন করিয়া, তাহার পরিবর্ত্তে নূতনের অনুশীলন করিতে হইবে। পুরাতন যাহা, তাহা উপযুক্ত মনোযোগ অভাবে ক্রমেই অস্পষ্ট ও শেষে অদৃশ্য হইয়া যাইবে। পুনঃপুনঃ একই বিষয় আবৃত্তি করিলে, মনের মধ্যে যে চিহ্ন অঙ্কিত হয়, তাহা সহজে অপসৃত হইবার নহে; এবং আমাদের চিন্তার ধারা ঐ পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট পথেই আবার প্রবাহিত হইতে থাকে।

নিম্নোক্ত প্রণালীতে নূতন অভ্যাস গঠন করা যায়।

১। কোন নূতন অভ্যাস গঠনকালে তোমার প্রত্যেক কার্য্য এবং চিন্তা নির্ব্বন্ধাতিশয্যপূর্ণ হওয়া চাই। সর্ব্বদাই মনে রাখিবে, তোমার এই প্রথম প্রচেষ্টা যেন বিফল না হয়। খুব সতর্কতার সহিত পাদ-বিক্ষেপ করিতে হইবে—যেন ভবিষ্যতে এই পথে কোন অজানা বাধা না থাকে। প্রারম্ভেই পথের চিহ্ন যেন বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠে, যাহাতে পুনর্ব্বার চলিবার সময় উহা সহজেই চোখে ধরা পড়ে।

২। এই নূতন পথ নির্ম্মাণের দিকে মনকে স্থিরভাবে নিবদ্ধ রাখিবে, যেন উহা পুরাতন পথে কিছুতেই ধাবিত না হয়।

৩। এই পথে বারংবার যাতায়াত করিতে থাক, যেন উহার প্রত্যেক অংশ সর্ব্বদা তোমার মনশ্চক্ষুতে প্রতিভাত হইতে থাকে। এই প্রক্রিয়ার ফলে উহা তোমার কাছে অতি সুগম ও সুসাধ্য হইয়া যাইবে। কি ভাবে ঐ পথে গমনাগমন করা যায়, তাহাও পূর্ব্বেই ভাবিয়া রাখিবে।

৪। পূর্ব্বাচরিত পথে ভ্রমণ করিবার প্রবৃত্তি দমন কর। যতবার এইরূপ করিতে পারিবে, ততই তোমার

শক্তি বর্দ্ধিত হইবে ; কিন্তু একবার প্রলুব্ধ হইলেই বিপদ। এই সময় তোমার সঙ্কল্পের দৃঢ়তা, তোমার ধৈর্য্য এবং ইচ্ছাশক্তির অগ্নি-পরীক্ষা হইবে।

৫। সুনিশ্চিত এবং সুনিপুণভাবে ঐ পথের একটা প্রতিকৃতি মনে মনে অঙ্কিত কর, কিরূপে উহা তোমাকে গন্তব্য স্থানে পৌঁছাইয়া দিবে তাহা মনে মনে নিরূপণ কর। তৎপরে নির্ভীক চিত্তে অবিচলিত ভাবে লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হও ; আপন অভিপ্রায়-সিদ্ধির জন্য তৎপর হও। পশ্চাতের দিকে তাকাইয়ো না, অর্থোন্নতি তোমার লক্ষ্য। তোমার পথ যাহাতে প্রশস্ত এবং সুগম হয়, তাহার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা কর।

পঞ্চদশ অধ্যায়

স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠা

অনেকেরই একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে এবং তদনুযায়ী তাঁহারা বলিয়াও থাকেন যে, জগতে এমন অনেক অমূল্য বা বহুমূল্য বস্তু আছে যাহা তাঁহারা পাইবার অযোগ্য; কিন্তু এইরূপে তাঁহারা নিজেকে প্রতারিত করেন। বাস্তবিকই কি এই তাঁহাদের মনের কথা, না, তাঁহাদের অক্ষমতার অকরুণ বাণী? তাঁহাদের বাহ্যিক বিনয়ের অন্তরালে অনেক সময় অনেকটা বিটলামিই প্রচ্ছন্ন থাকে এবং তাঁহাদের এইরূপ উক্তি শুনিয়া লোকে অনেক সময় বীতশ্রদ্ধও হইয়া উঠে। কিন্তু সময় ও সুযোগ মত বিনা বা সামান্য চেষ্টায় উক্ত বহুমূল্য বস্তু লাভ হইলে, তাঁহারা তাহার কিছু ছাড়িয়া দিতে নারাজ,—যদিও মুখে তাঁহারা নিজেকে অযোগ্য এবং অতি নগণ্য বলিয়াই প্রকাশ করিয়া থাকেন।

আমার এ বিষয়ে কিছু মতভেদ আছে। আমার মনে হয়, জগতে এমন কিছু উত্তম বস্তু নাই, যাহা পাইবার

আমরা নিতান্ত অযোগ্য। তবে প্রাপ্তি সময়সাপেক্ষ হইতে পারে এবং নিজের শক্তি-সামর্থ্যের উপযুক্ত ব্যবহারের উপর নির্ভর করে। একদা কোন পত্রবাহক ফরাসী-সৈনিক অতি প্রয়োজনীয় কোনও সংবাদ লইয়া সম্রাট নেপোলিয়নের নিকট উপস্থিত হইবামাত্র তাহার অশ্বটি পথ-শ্রমের ক্লান্তি বশতঃ হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইল। নেপোলিয়ন পত্রের উত্তর লিখিয়া নিজের সুসজ্জিত অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন এবং সেই সাধারণ সৈনিককে উহাতে আরোহণ করিয়া যাত্রা করিতে আদেশ দিলেন। সৈনিক কিন্তু ঘোড়ার সাজ-সজ্জা ও পদ-মর্য্যাদা দেখিয়া একটু থতমত খাইয়া গেল। সে সম্রাটকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "সম্রাট! আমি সাধারণ সৈনিকমাত্র, আমি এই অশ্বের অযোগ্য।" নেপোলিয়ন উত্তরে ভর্ৎসনার সুরে বলিলেন, "অযোগ্য! ফরাসী সৈনিক জগতে কোন কিছুর জন্যই অযোগ্য নহে।" এই কথা সৈন্যদলে প্রচারিত হইবা-মাত্র তাহাদের মধ্যে নূতন বলের সঞ্চার হইল এবং অদম্য উৎসাহে তাহারা যুদ্ধ করিয়া অদ্ভুত কার্য্য সাধন করিল। নেপোলিয়ন মানুষের প্রকৃতি এবং মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন।

কাহাকেও যদি অনুক্ষণ বলা যায় "তুমি মাটীর

মানুষ, ক্রিমিকীট বিশেষ, তোমার কোন শক্তি নাই”, তবে ক্রমে এই কথায় তাহার বিশ্বাস জন্মে; তখন সে এরূপভাবে দমিয়া যায় যে, তাহার আর মস্তক উত্তোলন করিবার শক্তি থাকে না, সে তখন মাটীতেই লুটাইয়া পড়ে; লোকে তখন তাহাকে ঘৃণা এবং পদদলিত করিতে কুণ্ঠিত হয় না। কিন্তু তাহাকে আশার বাণী শুনাইয়া দাও, বল,—“তুমি ভগবৎ সৃষ্ট জীব, অসীম ঐশ্বর্য্যের অধিকারী, তোমার কাছে অসম্ভব কিছু থাকিতে পারে না। এমন কিছু উচ্চাদর্শ নাই, যাহা তুমি বস্তুগতভাবে লাভ করিতে অসমর্থ!” দেখিবে, তাহার মধ্যে এক অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কাজ যত বড় কঠিনই হউক না কেন, সে তাহা করিতে বিমুখ হইবে না। “মানুষ যেরূপ ভাবে, সে তাহাই হয়।”

এই জন্য আমি বারবার বলিতেছি যে, পৃথিবীর যে কোন বস্তু পাইবার তুমি উপযুক্ত। তোমার অমূল্য জীবন বৃথায় নষ্ট করিয়ো না, তুমি কোনরূপে মৃত্তিকার ক্রিমিকীট নও। মস্তক উন্নত করিয়া জগতে বিচরণ কর এবং তুমি যে শক্তির অংশ স্বরূপ এবং সকল ভোগ-সুখের অধিকারী, ইহাই জগতের কাছে প্রমাণিত কর।

যাহারা নিজের ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য স্থিরসঙ্কল্প,

প্রকৃতি তাহাদের সহায়তা করিয়া থাকে—তাহাদের মধ্যে বিশ্বাস, আত্মনির্ভরতা এবং আত্মসম্মান-জ্ঞান জন্মাইয়া দেয়। বসুন্ধরা বীরভোগ্যা, এখানে দুর্ব্বলের স্থান নাই। লজ্জা, ভয়, সঙ্কোচ পরিত্যাগ কর। কৃত্রিম বিনয় প্রদর্শন কিংবা নিজেকে সকল সময় নগণ্য বলিয়া প্রমাণ করার প্রচেষ্টা (যাহার গুণগান আমরা অনেক সময় লোক-মুখে শুনিতে পাই) কোন প্রকারে বাঞ্ছনীয় নহে।

যাঁহারা এইরূপ দুর্ব্বলতার প্রশ্রয়স্বরূপ এবং সর্ব্বপ্রকার উন্নতির পরিপন্থী বাণী প্রচার করিয়া থাকেন, তাঁহারা কিন্তু অনেক সময়ই ঐ অনুযায়ী কাজ করেন না। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বিনয়ের তাঁহাদের বড়ই অভাব; অনেকেই স্বভাবতঃ স্বার্থপর ও গর্ব্বিত এবং নানারূপ নিন্দা-প্রতিবাদ সত্ত্বেও তাঁহাদের সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা-তৃপ্তির প্রয়াস কিছুতেই বর্জ্জন করেন না। মুখে তাঁহারা অনেক কিছুই বলিয়া থাকেন, কিন্তু উহা শুধু লোকের প্রশংসা অর্জ্জনের জন্য শূন্যগর্ভ বাঁধা বুলি। এই সকল ভ্রান্তিজনক উপদেশ সর্ব্বথা পরিহার করিবে। তাহার পরিবর্ত্তে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে যে, তুমি জগতের সকল জিনিষ পাইবার যোগ্য। তোমার অধিকার-স্থাপনে এখন হইতেই সচেষ্ট হও।

গাছপালা, জীবজন্তু, মানুষ প্রভৃতি যাহাতে সবল

সতেজ ভাবে বর্দ্ধিত হইতে পারে, প্রকৃতির সর্ব্বদাই সেই চেষ্টা। জীব-রাজ্যের সমস্ত বস্তুই যাহাতে নিজ নিজ আকাঙ্ক্ষা, উদ্যম ও শক্তির বলে খাদ্যোপকরণ সংগ্রহ করিয়া পূর্ণতা লাভে সমর্থ হয়,প্রকৃতির সেই দিকেই লক্ষ্য। জীবদেহ পূর্ণতালাভ করিলে উহা সহজেই ঐশীশক্তি লাভে সমর্থ হয়। জীবন শুধু দুঃখ, দৈন্য এবং দুর্ব্বলতার মধ্যে অতিবাহিত হইবার জন্য নহে। সুখ, শান্তি, যশ, কীর্ত্তি এবং মহামানবতা লাভ করা আমাদের জীবনের লক্ষ্য ; কিন্তু অভাব পূরণের পন্থা জানা না থাকিলে কিরূপে আমরা শক্তিমান হইব ? পুষ্টির উপকরণ সংগ্রহ করিতে না পারিলে, বৃক্ষ কিরূপে বাঁচিবে—বর্দ্ধিত হইবে ?

যাঁহার ইচ্ছায় আমরা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি এবং যিনি আমাদের মধ্যে ক্ষুধা-তৃষ্ণার বোধ দিয়াছেন, তিনি আবার উহা তৃপ্তির পন্থা নির্দ্ধারণ করিবার ক্ষমতাও আমাদিগকে দিয়াছেন। তাঁহার অতুল ধনরাজী মানুষের সম্ভোগের জন্যই, উহাদিগকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না। কি দৈহিক, কি মানসিক, কি আধিদৈবিক সকল রকম পুষ্টির উপকরণ প্রকৃতিতে বর্ত্তমান। আমাদের দৈহিক ও মানসিক ক্ষুধাই উহাদের সত্ত্বা প্রমাণ করিয়া দেয়। এই ক্ষুধা তৃপ্ত করিবার বাসনা তোমার ন্যায্য। তোমার

যাহা, তাহাতে তোমার দাবী স্থির কর, স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠা কর। অপরের দ্রব্য অপহরণ না করিয়াও ইহা সম্ভব, কারণ পৃথিবীতে সমগুণ-বিশিষ্ট বহু দ্রব্য বর্ত্তমান।

ষোড়শ অধ্যায়

অর্থ লাভের প্রকৃষ্ট পন্থা—ব্যবসা

সংসারী মাত্রই অল্প-বিস্তর ব্যবসায়ী। কিন্তু "ব্যবসায়ী" সাধারণ অর্থে বণিককে বুঝায়। সভ্যদেশ মাত্রেরই ব্যবসা, বাণিজ্য ও শিল্পকলার উন্নতি সাধিত না হইলে, আর্থিক কষ্ট দূর হয় না। জাতীয় অর্থ-কৃচ্ছ্রতা এবং বেকার-সমস্যা সমাধান-কল্পে শিল্প ও ব্যবসায়ের বিস্তৃতি ও বৈচিত্র্য সাধন করিলে লক্ষ লক্ষ যুবকবৃন্দ উপার্জ্জনের সুগম পথ খুঁজিয়া পাইবে।

সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও এই দেশে এরূপ বাণিজ্য-বিস্তার ছিল যে, পণ্য সম্ভার লইয়া চীন, জাপান, আরব, মিশর প্রভৃতি দূরবর্ত্তী দেশে ভারত হইতে শত শত বিরাটকায় জলযান নিত্য প্রেরিত হইত। তখন ভারতীয় ব্যবসায়ীগণ বাহির্বাণিজ্যের দ্বারা প্রচুর ধন উপার্জ্জন করিতেন। তদানীন্তন কৃষক, শিল্পী ও ব্যবসায়ীকে সমাজের অন্নদাতা ও রক্ষাকর্ত্তা বলিলেও অত্যুক্তি হইত না। এই তিন শ্রেণীর লোকের প্রাধান্য ও কর্ম্মদক্ষতা থাকিলে, সমাজ

সজীব ও সচল থাকে। কিন্তু আমাদের দেশে আজকাল ব্যবসায়ীর সে প্রভাব অতি অল্পই আছে, কৃষক ও শিল্পীর প্রভাব নাই বলিলেও চলে।

আজকাল কত যে শিক্ষিত যুবক প্রতি বৎসর লেখা-পড়া শেষ করিয়া, কি করিবে স্থির করিতে না পারিয়া, বেকার অবস্থায় দিনপাত করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। ইহার মূল কারণ বিদ্যালয়ে তাহাদের হাতে-কলমে কোন অর্থকরী বা কারিগরি বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয় না; এমন কি, স্ব স্ব রুচি ও প্রগতি অনুযায়ী কোন্ কোন্ বিশিষ্ট কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া, তাহারা স্বচ্ছন্দে অর্থোপার্জ্জন করিতে পারে, তাহার একটা মোটামুটি আভাষ পর্য্যন্ত দেওয়া হয় না।

ব্যবহারিক জগতে ইহা প্রমাণিত সত্য যে, ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যতিরেকে ধনী হওয়া যায় না। শাস্ত্রে কোন কোন স্থলে "ধনী" শব্দের ব্যবহার আছে। "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি। তদর্দ্ধং রাজ-সেবায়াং ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ।" বাণিজ্যে সর্ব্বাপেক্ষা আয় বেশী, কৃষিতে তাহার অর্দ্ধেক, চাকুরীতে কৃষির অর্দ্ধেক, ভিক্ষাতে মোটেই আয় হয় না,—ইহা প্রাচীন শাস্ত্রকারদের বহুদর্শিতা-সিদ্ধ অভিমত। ইহাতে শিল্পের

উল্লেখ নাই ; হয়তঃ শিল্পকে ব্যবসায়ের অন্তর্গত করিয়াই উহ্য রাখা হইয়াছে। "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী" ইহা পুরাতন শাস্ত্রকথা বলিয়া কেহ কেহ অগ্রাহ্য করিতে পারেন ; কিন্তু বাণিজ্য না হইলে ঐশ্বর্য্য হয় না, তাহা আমেরিকা, ইংলণ্ড ও জাপান প্রভৃতি দেশের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিলেই স্পষ্ট প্রমাণিত হয়। ফলতঃ ব্যবসা-বাণিজ্যই বিত্তশালী হইবার প্রধান উপায়।

পূর্ব্বে পৃথিবীতে ব্যবসায়ীর সংখ্যা কম ছিল ; এখন প্রতিযোগিতা বাড়িয়াছে, শিক্ষিত ও সাহসী বহু লোক ব্যবসায়-ক্ষেত্রে নূতন কৌশল, নূতন আদর্শ ও নূতন প্রেরণা লইয়া প্রবেশ করিতেছে। আয় কম হইলেও মোটের উপর বহু লোকের উপার্জ্জনের স্পৃহা ও নব নব পন্থা আবিষ্কারের উদ্যম পূর্ব্বাপেক্ষা বাড়িয়া যাইতেছে। আমাদের দেশে চিন্তা করিয়া নূতন ব্যবসায়ের উদ্ভাবন করিবার শক্তি বড়ই কম। ইউরোপীয়দের ও মাড়োয়াড়ী-দের কার্য্য-প্রণালী ও ব্যবসার কৌশলগুলি অনুসরণ করিলেই নূতন ব্যবসায় বাহির হইয়া পড়িবে। সর্ব্বপ্রথমে যে সমস্ত দ্রব্য ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান, জার্ম্মাণী প্রভৃতি দেশ হইতে আসিয়া আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্যরূপে পরিগণিত হইয়াছে, তাহাই এ দেশে প্রস্তুত করিবার জন্য

যথেষ্ট সংখ্যক বিশেষজ্ঞ ও যথাপরিমাণে মূলধন নিযুক্ত হওয়া উচিত। দেশের চাহিদা বুঝিয়া নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের ব্যবসায় করিলে, শীঘ্রই প্রতিষ্ঠা লাভের ও লাভবান হইবার সম্ভাবনা।

যাহারা ব্যবসা করিবে, তাহাদের স্ব স্ব রুচি ও অভিলাষ অনুসারে তত্তৎ ব্যবসায় আরম্ভ করা উচিৎ। সেই কাজ করিতে যে সকল গুণ আবশ্যক, তাহাদের সে সমস্ত গুণ আছে কিনা, বা চর্চ্চার দ্বারা সেগুলি স্বপ্রকাশ হওয়া সম্ভবপর কিনা, তাহা বিশেষ বিবেচনা করিয়া, তবে যুবকদিগকে সেই কার্য্যে প্রবেশ করিতে দেওয়া আবশ্যক। বিভাগ মনোনয়নের গুণে, আমি দেখিয়াছি, বহু বালক তাহাদের রুচি ও পছন্দানুযায়ী ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া, আশাতীত উন্নতি লাভ করিয়াছে, ধনী হইয়াছে। স্কুল ও বাড়ীতে বালকগণের প্রকৃতি ও রুচি নির্ণীত হওয়া আবশ্যক এবং তদনুসারে তাহাদের ব্যবসায়ের বিশিষ্ট প্রণালী বা কর্ম্মের বিভাগ নির্ণীত হওয়া উচিত। যেন স্মরণ থাকে, ব্যবসায়ে শ্রমশীলতা ও মিতব্যয়িতা এই দুইটি প্রধান ও প্রাথমিক গুণ। সন্তানে এই গুণ দুইটি বিদ্যমান কিনা, তাহাও সর্ব্বাগ্রে পরীক্ষা করিয়া, পরে তাহাকে ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত করান সমীচীন।

নচেৎ ব্যবসায়ে সাফল্য লাভের আশা দুরাশা মাত্র।

কোন যুবক অর্থোপার্জ্জনের জন্য কোন ব্যবসায় নির্ব্বাচন বা কার্য্যকরী শিক্ষালাভের (Vocational Training) জন্য বৃত্তি-মনোনয়ন করিবার পূর্ব্বে সে স্বয়ং বা তাহার অভিভাবক বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন যে, এই ব্যবসায় বা এই বৃত্তি অবলম্বনে কিরূপ বিদ্যা, বুদ্ধি, পরিশ্রম ও মূলধন আবশ্যক। পেশা নির্দ্ধারণ করা প্রত্যেক উন্নতিকামী যুবকের পক্ষে জীবনের এক মাত্র আবশ্যকীয় কাজ; কিন্তু তাহা যেন অতি সাবধানতার সহিত গভীর আত্মবিশ্লেষণের পর নির্দ্ধারণ করা হয় এবং সেই কার্য্যে বা ব্যবসায়ে তাহার অভিরুচি, উৎসাহ ও সামান্য পারদর্শিতাও আছে কিনা, তাহা শীতল মস্তিষ্কে পক্ষপাতশূন্য দৃষ্টিতে বিচার করিয়া দেখা হয়। যেন ভবিষ্যতে এই কর্ম্মপন্থা নির্ব্বাচনের ফলে তাহাকে অনুতপ্ত হইতে না হয়।

আরও একটা বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে যে, এই ব্যবসায় বা বৃত্তির ক্ষেত্র বহুজনাকীর্ণ (over-crowded) কিনা এবং ইহার অদূর ভবিষ্যত আশাপ্রদ কিনা। যুবক যে পণ্যের ব্যবসা করিতে অগ্রসর

হইতেছে, সেই পণ্যের চাহিদা বাংলা দেশ বা বাংলার বাহিরে যথেষ্ট পরিমাণে আছে কিনা, উহার হাজা-শুখা আছে কিনা, উহার মূল্য বাজারে প্রায় স্থায়ীভাবে বজায় থাকে—না—ক্রমাগত উঠা নামা করিয়া থাকে। এবং ব্যবসাটি অনেক টাকার খেলা কিনা!

কোন সৎগুণবিশিষ্ট কৃতকার্য্য ব্যবসায়ীর নিকট কিছুকাল শিক্ষানবীশ থাকিয়া ব্যবসায়-প্রণালী শিক্ষা করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিলে, অকৃতকার্য্য হওয়ার সম্ভাবনা দূরীভূত হয়। ব্যবসায়ীর নিকট ব্যবসা শিক্ষা করিতে লজ্জা বা অপমান বোধ করা উচিত নহে। কি ধর্ম্মক্ষেত্রে, কি কর্ম্মক্ষেত্রে, কি ভাব-জগতে, কি বস্তুজগতে, গুরুকরণ না করিলে, উপযুক্ত ব্যক্তির নিকট রীতিমত শিক্ষাগ্রহণ না করিলে, সাফল্য লাভ করা যায় না। আমাদের দেশে ব্যবসায় শিখিতে গেলে, বিশেষজ্ঞগণ আবার অনেক সময় ফিরিয়াও চাহেন না! সামান্য কিছু "ফি" দিয়াও যদি কোন প্রসিদ্ধ ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করিয়া ব্যবসায়-পরিচালন-কৌশল হাতে-কলমে শিক্ষা করা যায়, তাহাও করিতে হইবে। ইউরোপ ও আমেরিকায়, এমন কি জাপানে, এ বিষয়ে যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা আছে। সামান্য সুপারিশ ও অল্প অর্থ-ব্যয়ে সেখানকার অধিকাংশ

ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের অন্তর্লোকে যে-কোন বিদেশী ছাত্র প্রবেশ করিতে পারেন। যে উপায়েই হউক, অন্ততঃ কিছু কাল কোনও প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ীর নিকট বিনা বা অল্প বেতনে চাকুরী স্বীকার করিয়াও বা শিক্ষানবিশ থাকিয়া ব্যবসায় হাতে-কলমে শিক্ষা করা উচিত। তাহা যাহার সুবিধা নাই, সে Government Comercial School বা কোনও Technical Schoolএ পড়িতে পারে। না শিখিয়া ব্যবসা আরম্ভ করিলে, কেহ বা অত্যন্ত বিলম্বে কৃতকার্য্য হয়, কেহবা প্রথমেই অকৃতকার্য্য হয়!

প্রায়ই দেখা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের কঠিন পরীক্ষায় যাহারা উত্তীর্ণ হইতে পারে না, তাহারা সুপ্রশস্ত কর্ম্ম-জগতে আপনাকে নিতান্ত অসহায়, অকর্ম্মণ্য ভাবিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। উক্ত পরীক্ষাসমূহে কৃতকার্য্য হওয়ার গুণ ব্যতীত, মানবের যে এমন অন্য গুণ থাকিতে পারে —যদ্বারা অর্থোপার্জ্জনে কোনো বাধা উপস্থিত হয় না, এবং ঐ উপাধি-লাভই যে মানব-জীবনের একমাত্র লক্ষ্য নহে, তাহা না বুঝিয়া, অনেক ছাত্র তিন চার বার একই পরীক্ষা দিয়া সময় ও স্বাস্থ্য নষ্ট করে। যে সব ছাত্র পড়াশুনার খরচ-পত্র অতি কষ্টে চালায় এবং পরীক্ষায় উচ্চতর বিভাগে বা আদৌ উত্তীর্ণ হইতে পারে না,

তাহাদের তৎক্ষণাৎ পড়া বন্ধ করিয়া কোনো অর্থকরী শিক্ষালাভে কিংবা শিল্প-ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করা উচিত।

শিল্প-ব্যবসায়ের নাট-মন্দিরে প্রবেশ করিতে গেলে, কিছু সাধারণ বিদ্যা-শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন ; তাহাতে বুদ্ধিবৃত্তি কিছু শাণিত হয়, হিসাব-নিকাশ একটু পাকাপাকিভাবে শিক্ষা করা যায়, আচার-ব্যবহার একটু মার্জ্জিত হয়, এবং গ্রাহকদিগের সহিত পত্র-ব্যবহারেও অনেকটা কেতাদোরস্ত হওয়া যায়। আমার মতে, অন্ততঃ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইয়া, কোন উচ্চাভিলাষী যুবকের ব্যবসায়-ক্ষেত্রে প্রবেশ-লাভ করিতে ইচ্ছুক হওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে।

উচ্চ ইংরাজি স্কুলে পড়িবার সময়, ছাত্রদিগকে বিভিন্ন প্রকারের কারিগরী বিদ্যার একটা প্রাথমিক জ্ঞান দান করা কর্ত্তব্য। এতদ্দ্বারা তাহারা বহু-জনাকীর্ণ উকিল, ডাক্তার, মোক্তার প্রভৃতি পেশার ক্ষেত্র হইতে প্রলুব্ধ দৃষ্টিকে অপসারিত করিয়া, শিল্প-বাণিজ্যের প্রতি প্রথম হইতেই আকৃষ্ট হইবে। সুখের বিষয়, সম্প্রতি সরকার বাহাদুর আমাদের এই যুক্তির সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিয়া, উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়সমূহে ধীরে ধীরে সামান্য কারিগরী শিক্ষার প্রবর্ত্তনে মনোনিবেশ করিয়াছেন।

মোট কথা, পঠদ্দশা হইতেই রুচি ও প্রবৃত্তি অনুযায়ী ভবিষ্যৎ জীবনের কর্ম্মপন্থা নিশ্চিতভাবে বাছিয়া লইতে হইবে। ব্যবসায়ে চাকুরী অপেক্ষা অধিক ধনাগম হয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু ব্যবসায়ীর মধ্যে যে সকল গুণ বর্ত্তমান থাকা আবশ্যক, তাহা পৃথিবীর সকল লোকের মধ্যে থাকে না এবং পৃথিবীর সকলেই ব্যবসাদার হইয়া উঠিলে, খরিদ্দার বলিয়া একটা শ্রেণী থাকে না। ব্যবসায়ী-সুলভ গুণাবলী অনেক ক্ষেত্রে বাল্যকাল হইতে ধীরে ধীরে পরিস্ফুট হইতে আরম্ভ করে। যৌবন প্রারম্ভেই এক-একজন ব্যক্তি, ব্যবসায় করিবার একটা দুর্ণিবার প্রেরণা অন্তরে ক্রমাগত উপলব্ধি করিতে থাকেন। এই সঙ্গে কিছুদিন হাতে-কলমে ব্যবসা শিক্ষা করিয়া, কৃতকার্য্যতার দৃঢ় সঙ্কল্প এবং সামান্য মূলধন লইয়া, তাঁহাদের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলেই হইল!

প্রথমেই বড় ব্যবসায়ের পশ্চাদ্ধাবন না করিয়া, ছোট ব্যবসায় শিখিয়া, সামান্য, মূলধন লইয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। সামান্য পরিমাণে ব্যবসায় আরম্ভ করা নিরাপদ। কেননা, ইহাতে দায়িত্ব ও লোকসানের আশঙ্কা থাকে সামান্য, কিন্তু হাতে-কলমে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করিবার সুবিধা থাকে

প্রচুর। তাই বলিয়া, অল্পে চির-সন্তুষ্ট থাকিলে চলিবে না, এবং অমিতব্যয়ীও হইলে চলিবে না। সর্ব্বদা অত্যন্ত হিসাবী হইতে হইবে এবং একটি পয়সার প্রতি মমত্ব-বোধ জন্মাইতে হইবে। বিলাসিতা ও লোক-লজ্জাকে কায়-মনোবাক্যে বর্জ্জন করিতে হইবে। দুই পয়সা লাভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গৃহে ও গৃহের বাহিরে "বাবু" বনিয়া গেলে, ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ করা সুদূরপরাহত হইয়া উঠে। অনেকটা এই কারণের জন্যই বাঙ্গালীরা সাধারণতঃ ব্যবসায়ে উন্নতি লাভ করিতে পারেন না। তাঁহাদের আর একটা মহৎ দোষ শ্রম-বিমুখতা ও ক্রমশঃ কর্ম্ম-শৈথিল্য। এইগুলি প্রথম হইতে সমূলে উৎপাটন করা উচিত।

এ যাবৎ পৃথিবীতে ব্যবসায় করিয়া যাঁহারা শ্রেষ্ঠ ধনবান বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন, তাঁহারা প্রথমে অতি সামান্য অবস্থা হইতে ধীরে ধীরে উন্নতি লাভ করিয়াছেন। ইঁহাদের জীবনী শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করা উচিত। আমাদের দেশের সার রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জী, সার দোরাব্‌জী টাটা, ৺ জে, এফ্, ম্যাডান, ৺ বটকৃষ্ণ পাল প্রমুখ লোকবিশ্রুত ব্যবসায়ীবৃন্দের অসাধারণ অধ্যবসায়, অদ্ভুত কর্ম্মনৈপুণ্য ও বিরাট ব্যবসা-প্রতিভা সকলের

আদর্শ হওয়া উচিত। আমেরিকার হেন্‌রী ফোর্ড (Henry Ford), জার্ম্মেণীর Krupp প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ধনকুবের ব্যবসায়ীগণ সামান্য অবস্থা হইতে কর্ম্মজীবনের সূত্রপাত করিয়া ও মুটে-মজুরের ন্যায় নিজহস্তে শ্রম-বহুল কার্য্য করিতে শিখিয়া, স্বীয় বুদ্ধিবলে ও একনিষ্ঠ সাধনার গুণে কর্ম্মবীর-সমাজের শিরোমণি হইয়াছেন।

আর একটা কথা এস্থলে স্মরণযোগ্য। অর্থ উপার্জ্জন করিবার পূর্ব্বে বিবাহ করা কোনক্রমে উচিত নহে। কারণ নিজেকে বহন করিবার শক্তি যাহার নাই, অপরকে বহন করিবার ইচ্ছা তাহার ধৃষ্টতারই নামান্তর। এমন কি, অভিভাবকগণ সচ্ছল অবস্থাপন্ন হইলেও বিবাহ করা অন্যায়; যেহেতু নিজ উপার্জ্জনের অন্নে পুত্র-পরিবার প্রতিপালন করিতে না পারা গভীর লজ্জার বিষয়। অনেক পরিবারে বৃদ্ধা মাতা, দিদিমা, অথবা ঠাকুরমাগণ বাল্য বা কিশোর বয়সে, ছাত্রাবস্থায় কিংবা কর্ম্মহীন অবস্থায় স্নেহভাজনদিগকে বিবাহ দিয়া, তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবন-পথ কণ্টকময় করিয়া যান। বাল্য-বিবাহের ফলাফল সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা না করিয়া, মাত্র প্রসঙ্গক্রমে এইটুকু বলা কর্ত্তব্য বোধ করি যে, অপরিণত বয়সে বা পরমুখাপেক্ষী অবস্থায় বিবাহ করিলে,

প্রায়ই ক্ষেত্রেই মনের একাগ্রতা নষ্ট হইয়া যায়—কর্ত্তব্য-বোধ দ্বিধা বিভক্ত হইয়া যায় এবং উৎসাহ ও সাহসিকতা সুস্পষ্টভাবে হ্রাস পায়। স্বাবলম্বী হইয়া বিবাহ করা প্রত্যেক যুবকেরই একান্ত কর্ত্তব্য!

সৎ, অভিজ্ঞ ও কর্ম্মঠ লোকের মূলধনের অভাব হয় না। সামান্য পুঁজি লইয়াই ব্যবসা আরম্ভ করিবে। ব্যবসা করিতে করিতে যদি এমন অবস্থায় উপনীত হও যে, আরও মূলধনের প্রয়োজন, তখন যে ধনীর নিকট যাইবে, তিনিই বিশেষ আগ্রহের সহিত মূলধন দিবেন। ব্যবসায় আরম্ভ করিবার সময় বা পূর্ব্বে একান্ত আত্মীয় বা বান্ধব ব্যতীত কেহ মূলধন দেয় না; এবং ঋণ করিয়া পুঁজি সংগ্রহ করাও আদৌ যুক্তিযুক্ত নহে। কারবারের অবস্থা ভাল দেখাইতে পারিলে, ধনীর নিকট হইতে বা ব্যাঙ্ক হইতে অর্থ সাহায্য পাওয়া দুষ্কর নহে। কার্য্য নিজে ভালরূপ শিক্ষা করিলে ও ব্যবসায় বিস্তৃত করার প্রয়োজন হইলে, কয়েকজন অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী ও প্রতিপত্তি-শালী ধনী ব্যক্তির সহায়তায় লিমিটেড কোম্পানী করিলে, যথেষ্ট মূলধন সংগ্রহ করিতে পারা যায়।

অর্থ-নীতি (Economics) অতি কঠিন ও দুর্ব্বোধ্য বিষয়। তবে সাধারণভাবে সকলেই ইহার মূল নীতি-

গুলি কিছু কিছু জানেন। ব্যবসায়ী মাত্রেরই অর্থ-নীতি জ্ঞান বিশেষ প্রয়োজনীয়। অনেক সময়ে ব্যবসায়ীর মধ্যে ইহা সহজাত সংস্কাররূপে দেখা যায়। এই গুণ রীতিমত বুদ্ধিমান লোকেরও অতি সামান্য থাকিতে পারে, অথচ সামান্য বুদ্ধিমান লোকেরও যথেষ্ট থাকিতে দেখা যায়। প্রথমেই বলিয়াছি, ব্যবসায়ে হিসাবী ও মিতব্যয়ী হওয়া উচিত। কিন্তু মিথ্যা-মিতব্যয় (False economy) বা কৃপণতা ভাল নহে। সঞ্চয় করা আবশ্যক সন্দেহ নাই; কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, সদ্ব্যবহারের জন্যই অর্থ অর্জ্জন করা হয়। নিজের ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য ও পারিবারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য আয় বুঝিয়া যথাসাধ্য ব্যয় করা অনুচিত নহে। ব্যবসায়ে যথেষ্ট উপার্জ্জন হইলে, লোকহিতকর কার্য্যে দান করাও সমীচীন; ব্যবসায়-নীতির দিক হইতেও তাহা উন্নতি-বিধায়ক।

যে ব্যবসায়ী প্রথম হইতেই লাভের গণ্ডা বুঝিয়া লইবার জন্য উদগ্রীব, তাহার ব্যবসায়-জ্ঞানকে তেমন পরিপক্ক বলা যায় না। ক্রমশঃ লাভ করিতে করিতে তাহার সাহস বাড়িয়া যায়; ফলে হয়ত বিক্রেয় পণ্যে ভেজাল চালাইতে গিয়া সে খরিদ্দারের নিকট ধরা পড়িয়া যায়, নচেৎ লোভের বশবর্ত্তী হইয়া কোন অসমসাহসিক

কার্য্যে হাত দিয়া সমূহ লোকসান করিয়া ফেলে। সাধুতা ও সদাচারণ ব্যবসায়ের প্রাণ। এমন কোন মিথ্যা কার্য্য বা বাক্যের আশ্রয় লওয়া উচিত নহে, যদ্বারা সাক্ষাৎ ভাবে খরিদ্দার বা সমব্যবসায়ীর কোনরূপ ক্ষতি হয়।

বড় বড় ব্যবসায়ীর জীবন-চরিত আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, নিরবচ্ছিন্ন উন্নতি কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই। উত্থান-পতন সকল প্রকার কর্ম্মজীবনেই আছে। কিন্তু ব্যবসায় জগতে প্রতি পদ-বিক্ষেপ অতি সাবধানে ও সুচিন্তার সহিত করিতে হইবে এবং দৈব দুর্ব্বিপাকে নিরাশ, অবসন্ন হইলে চলিবে না। ব্যবসায়-রাজ্যে মাঝে মাঝে বাধা পাওয়া অনেকটা স্বাভাবিক বলিয়াই বোধ হয়। বাধা কোন্ দিক হইতে আসিতেছে ও তাহার কারণ কি—তাহা বিচার-বিশ্লেষণ পূর্ব্বক স্থির করিয়া উহা দূর করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। ব্যবসায়ের স্থান, মূলধনের পরিমাণ, কর্ম্মচারীর অসাধুতা বা কর্ম্মনিষ্ঠার অভাব প্রভৃতি সম্বন্ধে বাধা উপস্থিত হইলে, তাহা অচিরে দূর করিতে হইবে। এক একটা বাধার সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে মানুষের অনেক অভিজ্ঞতা-সঞ্চয় হয়, এবং জীবনের সহিত আরো ঘনিষ্টভাবে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাওয়া যায়! বাধার সম্মুখে মাথা নত করা,

বিপদের মধ্যে বুদ্ধি-বিবেচনা ও ধৈর্য্যহারা হওয়া, মূর্খতা ও কাপুরুষতার লক্ষণ। ব্যবসায়ে অতি ভীরুতা ও দুঃসাহসিকতা—দুই-ই দোষাবহ।

কোন ব্যবসায় করিবার প্রস্তাব হইলেই তৎক্ষণাৎ তাহা আরম্ভ না করিয়া, কিছুদিন এই ব্যবসায়ের দোষ-গুণ, সুবিধা-অসুবিধা, স্থান-কাল সম্বন্ধে বিশেষ বিচার ও অনুসন্ধান করিয়া, তারপর উহাতে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। কোন "পাকা" ও সর্ব্বসময়ে চাহিদাওয়ালা মালের ব্যবসায় আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে ঐ দ্রব্যের পুরাতন কোন কারবার সস্তাদরে কিনিতে পাওয়া যায় কি না, খোঁজ করিয়া দেখা উচিত। পুরাতন কারবার ক্রয় করিলে, অবিক্রেয় জিনিষ কিছু লইতে হয় বটে, কিন্তু স্থাপনের পরিশ্রম করিয়া সময় নষ্ট করিতে হয় না, পুরাতন গ্রাহকও কতক পাওয়া যায় এবং ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াই বেচা-কেনা সুরু করিতে পারা যায়।

অন্য ব্যবসায়ে যথেষ্ট লাভ হইতেছে দেখিয়া, যদি সেই ব্যবসায় করিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে অপেক্ষাকৃত কম লাভের ব্যবসা—যাহাতে তুমি নিযুক্ত আছ, তাহা একেবারে ত্যাগ করা উচিত নহে। তদুপরি বিশেষ সাবধান হইয়া উহাতে হাত দেওয়া এবং ঐ লোভনীয়

নূতন ব্যবসায়ে তোমার যথোপযুক্ত অভিজ্ঞতা আছে কিনা, তাহাও বিবেচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। অজ্ঞাত ব্যবসায় বাহির হইতে বেশী লাভবান্, সহজসাধ্য ও সুবিধাজনক বলিয়া অনুমিত হয়। বস্তুতঃ উহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে দেখা যায়, উহাতে একদিকে হয়ত অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে, অন্যদিকে হয়ত শিক্ষা-সাপেক্ষ নানারূপ জটিল প্রয়োগ-কৌশল আছে।

ব্যবসায়ে কতকগুলি বিষয় গোপন রাখার বিশেষ প্রয়োজন। ব্যবসায়ের লাভ লোকসান কাহাকেও বলিতে নাই। কোথা হইতে কত দরে মাল ক্রয় করা হয় এবং কাহাকে কি মূল্যে বিক্রয় করা হয়, এবং কোনও পেটেণ্ট দ্রব্য কি কি উপাদানে প্রস্তুত হয়, তাহাও যথাসাধ্য গোপন রাখিতে চেষ্টা করা উচিত। কারবার যত বিস্তৃত হউক না কেন, তাহা নিত্য পরিদর্শন এবং তাহার তহবিল ও মূল হিসাব সর্ব্বদা নিজের কাছে রাখিতে হয়। কোনও কর্ম্মচারীকেই পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করিতে নাই, যদিও বাহ্যতঃ তাঁহাদের প্রতি বিশ্বাসের ভাব বজায় রাখিতে হয়। কিন্তু সর্ব্বদা তাঁহাদের গুণের আদর করিবে এবং পরিশ্রমের যথোচিত মূল্য দিবে।

কোনও কোনও ব্যবসায়ে সাময়িকভাবে ধার দিতে ও ধার করিতে হয়। কিন্তু লোকের আর্থিক অবস্থা ও দেনা পরিশোধের অভ্যাস বুঝিয়া ধার দিবে। তোমার ঋণের পরিমাণ যেন পাওনার পরিমাণ-অপেক্ষা সর্ব্বদা কম থাকে। বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনকে, সাধ্যায়ত্ত হইলে, দান করিয়ো; কিন্তু কদাচ তাঁহাদিগকে ঋণ দিয়ো না বা তাঁহাদিগের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়ো না। একেবারে অনন্যোপায় না হইলে কারবার বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার করিয়ো না। যতদূর সম্ভব নগদ মূল্যে কারবার করিতে চেষ্টা করিবে। খরিদ্দার ও মহাজনদিগের নিকট সর্ব্বদা প্রতিশ্রুতির মূল্য রাখিবে।

যাহার হস্তে অল্প মূলধন, তাহার এমন ব্যবসা আরম্ভ করা উচিত,—যাহার হাজাশুক অত্যল্প, চাহিদা বেশী, অথচ প্রতিযোগিতা কম। কিন্তু বড় ও পাকা কারবারীর পক্ষে প্রতিযোগিতাবহুল ক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়াই বাঞ্ছনীয়, কারণ তাহাতে লাভের সম্ভাবনা অধিক। অন্তর্বাণিজ্য অপেক্ষা বহির্বাণিজ্যে লাভ অধিক বটে, কিন্তু প্রতিযোগিতাও অধিক এবং মূলধনও অধিক আবশ্যক। সর্ব্বদা এই সত্যটি মনে রাখিবে যে, ধনবান একদিনে হওয়া যায় না, সময়সাপেক্ষ—ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে উপার্জ্জনের

সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতে হয়। কিছু অর্থ জমিলে, তাহার সুসঙ্গত নিয়োগ দ্বারা ও তাহাকে নানা প্রণালীতে খাটাইয়াও উহা বহু গুণ বৰ্দ্ধিত করা যায়।

ব্যবসায় ব্যতীত স্বাধীন পেশা (যথা ডাক্তারী, ওকালতি প্রভৃতি) এবং সরকারী চাকরীতেও অর্থাগম হয়; কিন্তু পৃথিবীতে এ যাবৎ কোনও চাকুরীজীবীই ধনবলে ব্যবসায়ীর সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। তাহা ছাড়া, স্বাধীন পেশা ও চাকুরীর ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর বুদ্ধি-বৃত্তি ও কৃতিত্বের যথেষ্ট পরিচয় ইতিমধ্যেই পাওয়া গিয়াছে; এবং এই দুইটি ক্ষেত্রও অধুনা বহুজনাকীর্ণ ও অপেক্ষাকৃত কম লাভজনক হইয়া পড়িয়াছে। ব্যবসায় ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর মেধাশক্তি এখনও তেমন ভাবে পরিস্ফুট বা পরিচালিত হয় নাই এবং ইহাকে সম্মানজনক পেশা বলিয়া এখনও আমরা গ্রহণ করিতে শিখি নাই। ইহা অত্যন্ত দুঃখের কথা!

ব্যবসায় সম্বন্ধে শেষ কথা—নিয়মনিষ্ঠা ও প্রচার। প্রত্যেক ব্যবসায়ই কতকগুলি সাধারণ ও কতকগুলি ব্যক্তিগত নিয়ম ও নীতিসূত্র দ্বারা পরিচালিত হয়। কোনও অবস্থায়ই এই নীতিগুলির পরিবর্ত্তন করা বা ব্যক্তি-বিশেষের জন্য তাহা ভঙ্গ করা উচিত নহে। বিজ্ঞাপনের

কদর বহু দেশীয় ব্যবসায়ী বুঝেন না। যে অঞ্চলে যে শ্রেণীর লোকের মধ্যে তোমার মালের কাট্‌তি অধিক হওয়ার সম্ভাবনা, সেই অঞ্চলের তত্তৎ শ্রেণীর ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক পঠিত সাময়িক পত্রে বিজ্ঞাপন দিতে হয়। প্রয়োজন মত মাঝে মাঝে 'ক্যান্‌ভাসার' পাঠাইতে, অকাতরে নমুনা দিতে, দেওয়ালে 'প্লাকার্ড' লাগাইতে ও 'হ্যাণ্ডবিল্‌' বিলি করিতে হয়।

লাভের মাত্রা বেশী করিতে চাহিলে, একদিকে মালের কাট্‌তি যাহাতে বেশী হয়, অন্যদিকে নিরর্থক ব্যয়বাহুল্য যাহাতে সঙ্কুচিত হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান্‌ হইবে। কদাচ মালের উৎকর্ষ কমাইতে চেষ্টা করিয়ো না। ব্যয়াল্পতা বিষয়ে পাশ্চাত্য বণিক অপেক্ষা ভারতীয় ব্যবসায়িগণ অধিকতর উন্নত। আবার বাঙ্গালী অপেক্ষা অবাঙালীরা আরও বেশী দক্ষ। পশ্চিমা, মাড়োয়ারী ও ভাটিয়া ব্যবসায়ীদিগের এই গুণটি ও ব্যবসায়ের অন্যান্য কৌশল বাঙ্গালীমাত্রেরই শিক্ষার বিষয়। সুখের কথা, আজকাল বহু বাঙ্গালী যুবকের ব্যবসার প্রতি মন আকৃষ্ট হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক শ্রমশিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্বারা বাঙ্গালার শিক্ষিত ও উদ্যোগী ভদ্র-সন্তানগণ অচিরে সম্পৎশালী হইয়া উঠুক, তাহাদের উপার্জ্জনে বাঙ্গালার নিরন্ন

পরিবারগুলি ধনধান্যে-হাসি-গানে পরিপূর্ণ হইয়া উঠুক, তাহাদের দানে কোটি দুর্ভাগার দুঃখমোচন ও পল্লীর শ্রীবৃদ্ধিসাধন হউক্—ইহাই আমার একান্ত শুভ কামনা !

সপ্তদশ অধ্যায়

অর্থের নিয়োগ-কৌশল

"অর্থ-স্বাচ্ছন্দ্য মনে আস্বস্তিভাব আনয়ন করে; উহার অভাব লোকের আত্মসম্মান-বোধ নষ্ট করিয়া দেয়।"

ইতিপূর্ব্বে আমরা অর্থোপার্জ্জন-নীতিসম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছি এবং অর্থলোভেচ্ছু ব্যক্তি কি কি গুণাবলীর অধিকারী হইলে, নীতির সহিত সুসঙ্গতি লাভ করিতে পারে, তাহাও বিশদরূপে বলা হইয়াছে। কিন্তু আলোচনার পরিসমাপ্তি এখনও হয় নাই।

অর্থনীতির দুই দিক—উপার্জ্জন ও ব্যয়। ব্যয় সম্বন্ধে কিন্তু আমরা এপর্য্যন্ত কিছুই বলি নাই। ব্যবহারিক ভাবে দেখিতে গেলে, পূর্ব্বোক্ত অধ্যায়গুলি যথাস্থানেই সন্নিবেশিত হইয়াছে। কারণ, কোন জিনিষ ব্যবহারের পূর্ব্বে কিরূপে উহা পাওয়া যায়, তাহা জানা কর্ত্তব্য।

কোন ব্যক্তি হয়ত অর্থকরী সকল প্রকার সাক্ষাৎ গুণের অধিকারী হইতে পারে, কিন্তু সে যদি কোনও জন-

মানবহীন অরণ্যে কিংবা সাহারার ন্যায় কোন বিশাল মরুভূমির মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে অর্থ তাহার কোন কাজেই আসে না। কারণ, এখানে অর্থ দ্রব্যমূল্য নির্দ্ধারণের জন্য ব্যবহৃত হয় না। পরন্তু মুদ্রা-গৃহের চাবিকাটি হাতে থাকিলেও কিরূপে অর্থ ব্যবহার কিংবা বর্দ্ধিত করিতে হয়, তাহা সঠিক না জানিলে, লোকের কাছে উহার কোনও মূল্য নাই। এইরূপ ভাবাপন্ন ব্যক্তি নিতান্ত ভবঘুরের মত সংসারে বিচরণ করে এবং শেষে হয়ত কোনও বন্ধুবান্ধবের অনুগ্রহ-প্রার্থী হয় কিংবা কোনও অনাথ-আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করে।

আমার সহিত জনৈক ভদ্রলোকের পরিচয় আছে। তিনি বিশিষ্ট গুণরাজী এবং অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াও যথোপযুক্ত ব্যবহারিক গুণের অভাবে কিরূপে নানা-বিধ দুঃখ-দৈন্যের ভিতর দিয়া জীবন-পথে অগ্রসর হইয়া-ছেন, তাহা বলিতে গেলে এক প্রকাণ্ড ইতিহাস উন্মুক্ত করিতে হয়। যৌবনে তিনি অর্থকরী কোনও বিদ্যা-শিক্ষা করেন নাই। পরন্তু তাঁহার সমস্ত পৈত্রিক পুঁজি অযথা ব্যয় করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়েন; এমন কি শেষে তাঁহার স্বাস্থ্য পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া যায়। এইরূপ অবস্থায় তিনি পশ্চিম দেশে চলিয়া যান এবং কিছু সামান্য কাজে নিয়োজিত

হন। একদিন আফিসে বসিয়া তিনি তাঁহার ভাগ্যবিপর্য্যয় এবং পরিণামের কথা ভাবিতেছিলেন, এমন সময় তিনি এক অদ্ভুত সত্যের সন্ধান পাইলেন। তিনি দেখিলেন যে, তিনি সামান্য কাজে জীবনে বিশেষ কোনও উন্নতি করিতে পারিবেন না ; অর্থ উপার্জ্জন করিতে হইলে অর্থকে তাঁহার ভৃত্যরূপে পরিণত করিতে হইবে।

এইরূপ উদ্দেশ্য স্থির করিয়া, তিনি কোন রেল কোম্পানীর রাস্তায় মাল বোঝাই পশুচালকের কাজে নিযুক্ত হইলেন। ইহার পর সমস্ত ভোগবিলাস বর্জ্জন করিয়া, তিনি কিছু কিছু অর্থ সঞ্চয় করিতে লাগিলেন। মিতব্যয়িতার ফলে প্রায় ছয় মাসের মধ্যে তিনি আংশিক মূল্য দিয়া দুইটি অশ্বতর ক্রয় করিলেন, এবং নিজেই উহাদের চালকরূপে আত্মনিয়োজিত হইলেন। ইহার পর সম্পত্তি বন্ধক দিয়া ধারে আরও একজোড়া অশ্বতর ক্রয় করিলেন এবং উহাদের জন্য একজন চালক নিযুক্ত করিলেন। ইহাদের মূল্য পরিশোধ করা হইলে, তিনি পূর্ব্ববৎ আরও একজোড়া, এবং তৎপর আরও দুই জোড়া অশ্বতর ক্রয় করিলেন! অতঃপর নিজে চালকের কাজ পরিত্যাগ করিয়া কণ্ট্রাক্টরের কাজ আরম্ভ করিয়া দিলেন। আরম্ভ অতি সামান্যভাবেই হইল বটে, কিন্তু

পরবর্ত্তীকালে তিনি আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য এবং পদোন্নতিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

এই ব্যক্তির কতকগুলি বিশিষ্ট গুণ ছিল, কিন্তু কিরূপে উহাদের বিকাশ হয়, তাহা তাঁহার জানা ছিল না। অবস্থা-বৈষম্যের ঘাত-প্রতিঘাতে শেষে তাঁহার চৈতন্যোদয় হইল!

প্রকারান্তরে বলিতে গেলে, শুধু হস্তসাহায্যেই সমস্ত কাজ নির্ব্বাহ করা যায় না। মস্তিষ্ক-প্রসূত বুদ্ধিই প্রধানতঃ দরকার। বুদ্ধি সাহায্যে, বিনা বা সামান্য অর্থ দ্বারা অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে অধিকতর অর্থ আয় করিতে হইবে।

কোনও বিখ্যাত ব্যবসায়ী বলিয়াছেন, "সময় মত একশত টাকা যথোপযুক্ত স্থানে লগ্নী করিলে, উহাতে যে আয় হয়, তাহা একটা চিরস্থায়ী কেরাণীগিরির আয়ের মতই।" এই বাস্তব সত্য সম্যক উপলব্ধি করিতে হইবে। কিন্তু কিরূপে প্রথম :শত টাকা আয় করা যায়? উত্তরে ইহাই শুধু বক্তব্য যে, মিতব্যয়িতার দ্বারা আয়-ব্যয়ের উদ্বৃত্ত অংশ সঞ্চয় করিতে হইবে।

যাহার কোনরূপ আয়ের পন্থা আছে, তিনি ইচ্ছা করিলেই ভবিষ্যতের আশায় সৌখীনতা কিংবা সুখস্বাচ্ছন্দ্য কিয়ৎ পরিমাণে বর্জ্জন করিয়া, প্রত্যেক মাসেই কিছু-না-

কিছু সেভিংস ব্যাঙ্কে জমা দিতে পারেন। কিছু দিন এই-রূপ করিবার ফলে পুঁজি ক্রমেই বাড়িয়া যায় এবং বড় ব্যবসায় করিবার মূলধন সংগৃহীত হয়; সঙ্গে সঙ্গে মিতব্যয়িতা এবং আত্ম-সংযম গুণও স্থায়ীভাবে লব্ধ হইয়া থাকে। ইহার পর এই টাকা এবং পরবর্ত্তীকালের আয়-ব্যয়ের উদ্বৃত্ত অংশ অধিক লাভে নিরাপদ স্থানে ব্যবসায়ে খাটাইতে হয়। সর্ব্বদাই হুঁসিয়ার হইয়া কাজ করিবে। কোন কিছুর বিরুদ্ধে পূর্ব্ব হইতেই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া কাজ করিয়ো না, কিংবা অপরের প্রতারণায় ভুলিও না। কোনও কোম্পানীর অংশ ক্রয় করিবার সময় কিংবা কোন ঋণসূচক দলিল (Bond) অথবা সম্পত্তি-বন্ধকী (mortgage) ধার দিতে হইলে, সকল দিক ভালভাবে বিচার করিয়া দেখিবে।

আমাদের দেশে কতকগুলি লোক নিতান্ত পরগাছার মত জীবিকা অর্জ্জন করিয়া থাকে। প্রতারণা ইহাদের ধর্ম্ম। কার্য্যোদ্ধার করিবার সময় ইহারা যে-কোনও শপথ করিতে দ্বিধাবোধ করে না। কিন্তু প্রতিজ্ঞাপালন করিবার দিকে আদৌ উহাদের লক্ষ্য নাই। নিজেদের প্রাপ্য মিটাইয়া লইতে পারিলেই "ইতি শেষঃ।" এই সকল লোক অনেক সময় অতিশয় সম্মানিত এবং পদস্থ

হইয়াও থাকেন। এমন কি ইঁহারা কোন ব্যাঙ্কের পরিচালক কিংবা কোনও বৃহৎ যৌথ কারবারের কর্ম্মকর্ত্তা; ইহারা এতদূর স্বার্থপর যে, নিজের বিবেক-বুদ্ধি বিসর্জ্জন দিয়া লোককে প্রতারণা করিবার জন্য এক-একটী ভূয়া ব্যবসা ফাঁদিয়া বসেন এবং নানারূপ ছলনায় ভুলাইয়া জন-সাধারণের নিকট হইতে অর্থ আদায় করেন। কিছুদিন পরে দেখা যায় যে, সাধারণের সমস্ত অর্থই তাঁহারা উদরসাৎ করিয়া সরিয়া পড়িয়াছেন। এইজাতীয় ফন্দীবাজ হইতে শত হস্ত দূরে থাকিতে হইবে। ব্যবসায়ে টাকা খাটাইবার যে সকল প্রশস্ত পন্থা আছে, সেই সম্বন্ধে অতঃপর কিছু আলোচনা করিব। বিভিন্ন ব্যবসায়ের সুবিধা-অসুবিধাও যথাক্রমে বর্ণনা করা হইবে।

প্রথমতঃ গভর্ণমেণ্টের দায়সূচক দলিলই (Government Security) সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ। ইহার টাকা কয়েক বৎসর পরে প্রাপ্য এবং সুদের হার খুব অল্পই। সুতরাং অল্প পুঁজিদারের ইহা ক্রয় করিবার জন্য বিশেষ কোনও আগ্রহ নাই। ব্যাঙ্ক, ইন্সিওরেন্স কোম্পানী এবং অন্যান্য বড় বড় যৌথ-প্রতিষ্ঠানগুলি সাধারণতঃ ঐ সকল দলিল ক্রয় করিয়া থাকে। আয় অল্প হইলেও

পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট থাকায় ইহা ক্রয় করায় ব্যবসায়ের অনিশ্চয়তা বহু পরিমাণে হ্রাস পায়; পরন্তু এই ঋণ পরিশোধ গবর্ণমেণ্টের স্থায়িত্বের উপর নির্ভর করে এবং প্রত্যেকেরই ঐরূপ স্থায়িত্বে আস্থা আছে। গভর্ণমেণ্ট্ সিকিউরিটির বলে বড় বড় কারবারগুলি দুঃসময়ে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয়।

টাকা Post Office Savings Bankএ জমা রাখিলেও উহা হইতে কিছু আয় হইয়া থাকে। তবে এই আয়ের মাত্রাও খুব বেশী নহে। ব্যাঙ্কের জমা টাকা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে বেশী সুদে ধার দেওয়া হয়। আমানৎকারী শতকরা তিন হইতে সাড়ে চার টাকা পাইয়া থাকেন। ব্যাঙ্কে এক বৎসর বা দুই বৎসরের জন্য স্থায়ী আমানৎ (fixed deposit) রাখিলে, শতকরা ৫৲ বা ৬৲ সুদ পাওয়া যায়।

মিউনিসিপ্যালিটী কিংবা তদনুরূপ স্থিতিশীল অন্যান্য সাধারণ প্রতিষ্ঠানগুলিও দায়স্বীকার দলিল-যোগে (Debenture) ধার করিয়া থাকে। উহারা শতকরা ৪৲ কি ৫৲ টাকা সুদ দিয়া থাকে। অনেক সময় সম্পত্তির অভিভাবক বা অছি (Trustee) নিযুক্ত হইলে, সে গচ্ছিত সম্পত্তির দায় মোচন করিবার জন্য কোম্পানীর Bond ক্রয় করিয়া-

নিরাপদে টাকা জমাইয়া থাকে এবং ইহা হইতে কিছু আয়ও হইয়া থাকে। অনেক সময় ঐরূপ করিতে তাহারা আইনতঃ বাধ্য। তবে এই সকল প্রতিষ্ঠান কতদূর নিরাপদ, Bond ক্রয় করিবার পূর্ব্বে তাহা যাচাই করিয়া লওয়া উচিত। এই সকল ঋণের আসল টাকা এবং সুদ পরিশোধ করিবার জন্য প্রতিষ্ঠানের অন্তর্গত সভ্যদিগের অনেক সময় এক প্রকার কর (Tax) দিতে হয়। বণ্ড ক্রয়-বিক্রয়ে সাহায্যের জন্য Share-market নামক এক প্রকার প্রতিষ্ঠান আছে। Bond ক্রয় করিবার সময় উহাদের পরামর্শ লওয়া উচিত। Share-market এবং কোন কোন ব্যাঙ্কেও এই সকল কারবার হইয়া থাকে।

ষ্টীম নেভিগেশন্, ইলেক্ট্রিক, রেলওয়ে কিংবা চা কোম্পানীর Bond বা Shares এক শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে। ইহাদের সুদের পরিমাণ খুব কম করিয়া ৭৲ হইতে ১০৲ টাকা।

জমি বন্ধকে যে টাকা দেওয়া হয়, তাহার সুদ শতকরা ৯৲ হইতে ১২৲ টাকা। যাহাদের মূলধন বেশী, তাহারা এইরূপে টাকা লগ্নী করা পছন্দ করেন। টাকা দেওয়ার পূর্ব্বে অপর পক্ষের আর্থিক অবস্থা সম্যক জানিয়া লওয়া উচিত—তাহাদের সুদের টাকা কিস্তিমত দেওয়ার

ক্ষমতা আছে কিনা? তাহাদের নৈতিক অবস্থাও বিশেষ লক্ষ্যের বিষয়। কিন্তু এই কারবারে সময় সময় বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। যে সময় সম্পত্তির মূল্য বাড়িয়া যায়, তখন আসল ও সুদ সম্পূর্ণ আদায় হইয়া থাকে। আবার মূল্য কমিয়া গেলে, ক্ষতির আশঙ্কাও যথেষ্ট। এই সকল বিবেচনা করিয়া টাকা দিতে হইবে। গরম বাজারে উৎসাহের আধিক্য দেখাইতে নাই।

যে সকল প্রতিষ্ঠান কোন পণ্য উৎপাদন করিয়া থাকে, তাহাদের অংশ অনেক সময় ৫৲ হইতে ১০৲ টাকা পর্য্যন্ত সুদে বিক্রীত হয়। কিন্তু এই সকল ক্রয় করিবার সময় বিশেষ সাবধান হইতে হইবে; কারণ অংশগুলির দাম প্রায় সর্ব্বদাই উঠা-নামা করিয়া থাকে। এই সকল উঠানামা নির্ভর করে—

১। দেশের সাধারণ ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর।

২। আলোচ্য ব্যবসায়ের অবস্থার উপর।

৩। অন্যান্য ব্যবসায়ের সহিত প্রতিযোগিতার পরিমাণের উপর।

৪। কার্য্য-নির্ব্বাহ-পদ্ধতির উপর।

যাহাদের সহিত ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইবে, তাহাদের চরিত্র বিশেষভাবে জানিয়া রাখা উচিত। তাঁহাদের

মধ্যে অনেকে আছেন, যাঁহারা প্রকৃত সৎ—যাঁহারা ব্যবসায়-ক্ষেত্রে বিশেষ সুখ্যাতি ও অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন। ইঁহাদের সহিত পরামর্শ করিলে, অনেক সময় সুফল পাওয়া যায়।

উপরি-উক্ত উপায়ে টাকা খাটান ছাড়া অর্থোপার্জ্জনের আরও অনেক পন্থা আছে; সময় ও সুযোগ বিশেষে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিতে হয়। কিন্তু এক জায়গায় টাকা খাটাইতে গিয়া ব্যর্থ হইলে নিরাশ হওয়ার কোনও কারণ নাই। একেবারে নিঃস্ব হইয়া পড়িলেও অগৌরবের কিছুই নাই। দ্বিগুণ উৎসাহে কার্য্যে রত হও এবং হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার কর। "ভুল না করাই একমাত্র উন্নতির উপায় নহে, কিন্তু একই ভুল দ্বিতীয় বার করা উচিত নহে।" জীবনের গতি যখন বাধাবিঘ্নহীন—জয়শ্রীমণ্ডিত, তখন স্বভাবতঃই চারিদিক হাস্যানন্দে উদ্ভাসিত হয়; কিন্তু যখন উহা নানারূপ ভুল-ভ্রান্তি ও ব্যর্থতার কর্দ্দমে পঙ্কিল হইয়া উঠে, তখনও যেন প্রাণ আশাময় ও মুখ হাসিভরাই থাকে।

কারবারে টাকা খাটাইতে হইলে, প্রস্তাবিত কারবারের কতকগুলি ভিতরের খবর জানিয়া লওয়া উচিত। অনুষ্ঠান-পত্রে যথোপযুক্ত খবর না পাইলে, কোম্পানীর

কোনও উচ্চ কর্ম্মচারীর নিকট হইতে জানিয়া লওয়া সঙ্গত।

নিম্নোক্ত বিষয়গুলি প্রত্যেক ব্যবসায়ী এবং অর্থ-উপার্জ্জনেচ্ছু জনসাধারণের বিশেষ জ্ঞাতব্য।

ক। ব্যবসায়ের প্রকৃত অবস্থা—

(১) উহার মূল ভিত্তি কতদূর দৃঢ়?

(২) এইরূপ ব্যবসায় অপর কোথায়ও লাভজনক কিনা?

(৩) সমাবস্থার অন্যান্য ব্যবসায়ের সহিত ইহার প্রতিযোগিতার পরিমাণ কিরূপ?

(৪) অন্যান্য ব্যবসায়ের অনুপাতে ইহা কিরূপ সুযোগ-সুবিধা পাইয়া থাকে?

খ। ব্যবসায়ের গঠন-প্রণালী—

(১) কি অবস্থায় উহা গঠিত হইয়াছে? উহার মূলধন কত এবং মূলধন যথোপযুক্ত কিনা?

(২) কারবারের অংশ-সংখ্যা এক কিংবা বহু এবং প্রত্যেক অংশের পরিমাণ কত?

(৩) অংশগুলির মূল্য পূর্ণ মাত্রায় দেয় কিনা?

(৪) কোনও অংশের জন্য নির্দ্দিষ্ট লভ্য-ভাগ সর্ব্বাগ্রে দিতে হয় কিনা (Preference share)?

(৫) কোন অংশ অবিক্রীত আছে কিনা? জীবন-বীমা কোম্পানী হইলে, Treasuryতে Security জমা রাখা হইয়াছে কিনা এবং কত টাকা?

(৬) অংশগুলির কোন তত্ত্বাবধায়ক (Share-holders' Representative) নিযুক্ত হইয়াছে কিনা?

(৭) লঘিষ্ঠতম অংশে ক্রেতার স্বার্থ সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত হয় কিনা?

(৮) কোম্পানীর আইনে বিশেষ জ্ঞাতব্য কোনও ধারা আছে কিনা? থাকিলে তাহা কি?

(৯) কারবারের কি কি স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি আছে? উহাদের মূল্য কত এবং ঐ মূল্য কিরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে?

(১০) ঐ সম্পত্তি কোন দায়গ্রস্ত কিনা?

(১১) কারবার বন্ধ হইয়া গেলে, দেনা-পাওনা মিটাইবার জন্য সম্পত্তির মূল্য যথোপযুক্ত কিনা?

গ। কাজের নমুনা—

(১) বর্ত্তমানে কি কি কাজ আরম্ভ করা হইয়াছে এবং উহাদের ফল কি দাঁড়াইয়াছে?

(২) ব্যবসায়-জাত পণ্যদ্রব্যের চাহিদা কিরূপ?

(৩) কারবারের বর্ত্তমান অবস্থা কি ?

(৪) হিসাবপত্র যথারীতি রাখা হয় কিনা ?

ঘ। ব্যবসায়ের অর্থ—

(১) কোম্পানীর স্থিতের (assets) মূল্য কত ?

(২) কি কি নিয়মিত দেনা (যথা—কর্ম্মচারীর মাহিয়ানা, বাড়ী-ভাড়া, সেলামী ইত্যাদি) আছে এবং কিরূপে পরিশোধ করা হইয়া থাকে ?

(৩) সচরাচর ব্যয়ের পরিমাণ কি ? উহা আয় অপেক্ষা কখনও বেশী হয় কিনা ?

ঙ। পরিচালন-প্রণালী—

(১) পরিচালন-সমিতির সভ্যসংখ্যা কত ? এবং উহাদের নাম ও পরিচয়। তাঁহাদের সম্মান ও অভিজ্ঞতা এবং বর্ত্তমান ব্যবসায়-খ্যাতি।

(২) উঁহাদের মধ্যে কয়জন ব্যবসায়ের সঙ্গে মুখ্যভাবে সংশ্লিষ্ট ? কয়জন গৌণভাবে জড়িত ?

(৩) পরিচালন-সমিতির কার্য্য নিয়মিতভাবে নির্ব্বাহ করা হয় কিনা ?

(৪) কার্য্যাধ্যক্ষগণ যথোপযুক্ত সংখ্যক অংশ ক্রয় করিয়াছেন কিনা ?

চ। সাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয়—

(১) ব্যবসায়-সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি ও কাজের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ।

(২) ব্যবসায়ে সম্পূর্ণ নূতন কিছু উৎপন্ন হইলে, উহা কি এবং উদ্ভাবনের পরিচয়।

(৩) কে হিসাব-নিকাশ দেয় এবং সে বিশ্বাসযোগ্য কি না ?

(৪) কোম্পানী এমন কোনও চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছে কিনা, যাহা আপাততঃ কার্য্যকরী না হইলেও ভবিষ্যতে ক্ষতিকারক হইতে পারে ?

পরিশিষ্ট—ক

কতকগুলি শিল্প-বিজ্ঞান ও বাণিজ্য-শিক্ষালয়

বেঙ্গল ভেটারিনারী কলেজ, বেলগাছি, কলিকাতা

(Bengal Veterinary College, Belgachia, Calcutta)

উদ্দেশ্য—উপযুক্তরূপ শিক্ষিত পশু-চিকিৎসক তৈয়ারী করা।

শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ—য়্যানাটমি, রসায়ন, উদ্ভিদ-বিদ্যা, মেটিরিয়া মেডিকা, পশু-পরীক্ষা, ফার্ম্মেসী, স্বাস্থ্য-তত্ত্ব, ফিজিওলজি, পশু-ঔষধ, চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচার ইত্যাদি।

প্রবেশের উপযুক্ততা—ম্যাট্রিকুলেশন্ বা তদনুরূপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া চাই। যাহারা পাশ করে নাই, তাহাদিগকে এই কলেজের একটা বিশেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হয়।

সেসন—প্রতি বৎসর ১লা জুলাই সেসন্ আরম্ভ। তিন বৎসর কাল পড়িতে হয়। কিন্তু প্রত্যেক নূতন ছাত্রকে ১৫ই এপ্রিল হইতে ভর্ত্তি হইতে হয়।

অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়—কলেজের মাহিনা লাগে না। কলেজ-সংশ্লিষ্ট হোষ্টেল আছে, ১৮৮ জন ছাত্র থাকিতে পারে। প্রিন্সিপ্যালের নিকট দরখাস্ত করিতে হয়।

কলিকাতা রিসার্চ্চ ট্যানারী-সংলগ্ন চামড়া পাট্-করা শিক্ষালয়।

শিক্ষণীয় বিষয়—লেদার ব্যবসায়ের মূলতত্ত্ব, ঐ সম্বন্ধে বিশ্লেষণ-মূলক রসায়ণ, ট্যানারী সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্যকলাপ হাতে-কলমে শিক্ষা।

প্রবেশের উপযুক্ততা—ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষোত্তীর্ণ হওয়া চাই। আই-এস্‌সি বা বি-এসসি অবধি পাঠ করা বা পাশ করা ছাত্রেরা সর্ব্বাগ্রে গৃহীত হয়। কোন চাম্‌ড়ার কারখানা হইতে বিশেষভাবে শিক্ষার জন্য প্রেরিত হইয়া আসিলে, ম্যাট্রিকুলেশন্ ফেল্-করা যুবককেও গ্রহণযোগ্য মনে করা হয়।

সেসন—প্রতি বৎসরের আগষ্ট মাসের প্রথম

সপ্তাহ হইতে সেসন্ আরম্ভ হয়। দুই বৎসরে শিক্ষা সমাপ্ত হয়। কোন ফী লাগে না।

বৃত্তি—দুইজন বি-এস্-সি পাশ করা ছাত্রের জন্য ত্রিশ টাকা করিয়া এবং দুই জন আই-এস্-সি পাশ করা ছাত্রের জন্য কুড়ি টাকা করিয়া বৃত্তি ধার্য্য আছে। হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রদিগকে সমান ভাগে বৃত্তি বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়।

অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়—ছাত্রদের স্বাস্থ্য উত্তম হওয়া ও কঠোর পরিশ্রম করিবার শক্তি থাকা চাই। শিক্ষালয়-সংশ্লিষ্ট কোন হোষ্টেল নাই। Superintendent, Calcutta Research Tannery, P.O. Entally, Calcutta—এই নাম-ঠিকানায় দরখাস্ত পাঠাইতে হয়।

বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলী শ্রমশিল্প বিদ্যালয়

(ঠিকানা—১।৬ রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা)

শিক্ষা-বিভাগ—দর্জ্জির কাজ, বস্ত্র-বয়ন ও মোজা-গেঞ্জী বয়ন।

উপযুক্ততা—ধরাবাঁধা কোনো নিয়ম নাই। কিছু ইংরাজী বাংলা লেখা-পড়া এবং একটু গণিতে জ্ঞান থাকিলেই হইল।

সেসন—প্রতি জুলাই হইতে সেসন আরম্ভ। সাধারণতঃ শিক্ষার কাল এক হইতে দুই বৎসর।

অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়—দিনে-রাত্রে ক্লাস্ হয়। অনেক ভদ্রলোকের শিক্ষিত ছেলেরাও এখানে অধ্যয়ন করে। হোষ্টেলে ২০ জন ছাত্রের থাকিবার স্থান আছে। উক্ত বিদ্যালয়ের সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্টের নিকট দরখাস্ত করিতে হয়।

মহারাজা কাশিমবাজার পলি-টেকনিক্ ইন্‌স্‌টিটিউট্

(ঠিকানা—১নং নন্দলাল বসু লেন, বাগবাজার, কলিকাতা)

উদ্দেশ্য—কারিগরি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদিগকে ম্যাট্রিকুলেশন পর্য্যন্ত পড়ানো। সাধারণ লেখা-পড়া শিখিতে অনিচ্ছুক, বয়স্ক ছাত্রদের জন্য একটু উচ্চতর কারিগরি-বিদ্যাশিক্ষারও বন্দোবস্ত আছে।

শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ—কাঠের কাজ, মেশিন্-শপের কার্য্যপ্রণালী, ছুরী-কাঁচি নির্ম্মাণ ও লোহার

কাজ, বয়নশিল্প, মৃৎশিল্প, ঝুড়ি-বুনন্, উদ্যানকৃষি, দর্জ্জীর কাজ, শর্ট্ হ্যাণ্ড, টাইপ্ রাইটিং ও হিসাব-রক্ষণ।

সেসন—প্রতি জানুয়ারীতে আরম্ভ, ডিসেম্বরে শেষ।

মাহীনা—দর্জ্জীর কাজ শিখিতে মাসে ৪৲, মেশিন্‌শপের কাজে ৩৲, তাঁত বুনার কাজে ৩৲; শর্ট্ হ্যাণ্ড, টাইপরাইটিং ও বুক-কিপিং—প্রত্যেক বিষয়ে ৩৲, একত্রে দুইটি বিষয়ে ৪৲ ও একত্রে ৩টি বিষয়ে ৫৲; অন্যান্য বিষয়গুলিতে মাসে ২৲।

অন্যান্য জ্ঞাতব্য—প্রতি মাসে ২৲ করিয়া একটি বৃত্তির বন্দোবস্ত আছে। সংশ্লিষ্ট হোষ্টেল আছে। সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্টের নিকট দরখাস্ত করিতে হয়।

সরস্বতী ইন্‌সটিটিউসন্

(ঠিকানা—৭১, রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট্, বাগবাজার, কলিকাতা)

উদ্দেশ্য—উপরিউক্তরূপ।

শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ—বয়ন-শিল্প, রঞ্জন ও বস্ত্রমুদ্রন শিল্প, সূত্রধরের ও দর্জ্জীর কাজ।

সেসন—জানুয়ারী হইতে আরম্ভ। প্রতি বিষয় এক বৎসর কাল শিখিতে হয়।

মাহিনা ও বৃত্তি—সূত্রধরের কার্য্য শিখিতে প্রতি মাসে ২৲. অন্যান্য বিষয় ৪৲। ২৲ হইতে ১৫৲ পর্য্যন্ত ছয়টি ছাত্রবৃত্তি আছে। সেক্রেটারীর নিকট আবেদন করিতে হয়।

কলিকাতা টেকনিক্যাল স্কুল

(ঠিকানা—১১০, কর্পোরেশন ষ্ট্রীট, কলিকাতা)

উদ্দেশ্য—এঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য উপযুক্তরূপ শিক্ষিত শিক্ষানবীশ বা নিম্নতর কর্ম্মচারীসমূহ গঠন করিয়া তোলা। এস্থলে শিক্ষা করিলে, বড় বড় কলকারখানায় তাহারা সহজে চাকুরী পাইতে পারে এবং প্রথমে মাহিনা অল্প হইলেও গুণ দেখাইয়া অল্প দিনেই যথেষ্ট উন্নতি করিতে পারে।

শিক্ষণীয় বিষয়—গৃহ-নির্ম্মাণের মৌলিক তত্ত্ব, কাঠামো, তাড়িৎ-বিজ্ঞান, ম্যাগ্‌নেটিজ্‌ম্, ষ্টীম্ এঞ্জিন্, বয়লার ইত্যাদির তথ্যগত জ্ঞান, মেকানিক্যাল অঙ্কনবিদ্যা, ব্যবহারিক জ্যামিতি, গণিত ও যন্ত্রবিজ্ঞান, ইত্যাদি।

উপযুক্ততা—কোনো ধরা-বাঁধা নিয়ম নাই।

তবে ম্যাট্রিকুলেশন পর্য্যন্ত পড়া হইলে এবং গণিতে একটু পাকা হইলে ভাল হয়। কোনো এঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠানের সুপারিস-করা য়্যাপ্রেন্টিস্‌দিগকে বেশী পছন্দ করা হয়।

সেসন—নভেম্বরে আরম্ভ ও সেপ্টেম্বরে শেষ।

মাহীনা—প্রতি মাসে ৫৲ করিয়া। কোনো বৃত্তির বন্দোবস্ত নাই।

অন্যান্য জ্ঞাতব্য—সংশ্লিষ্ট হোষ্টেল নাই। ভর্ত্তি হওয়ার জন্য প্রিন্সিপ্যালের নিকট আবেদন করিতে হয়।

কলিকাতা টেক্‌নোলজিক্যাল কলেজ

(ঠিকানা—২০।১, লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা)

উদ্দেশ্য—অবিমিশ্রভাবে কারিগরি ও ব্যবহারিক শিক্ষা দেওয়া।

শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ—মেকানিক্যাল ও ইলেক্‌ট্রিক্যাল এঞ্জিনিয়ারীং; কেমিক্যাল টেক্‌নলজি; আর্টস্‌ ও ক্র্যাফ্‌ট্‌স্‌।

উপযুক্ততা—আই-এস্‌সি ও ম্যাট্রিকুলেশন্‌ পাশ চাই।

সেসন—জুলাই হইতে ডিসেম্বর।

মাহীনা ও বৃত্তি—ভর্ত্তি ফী ১০৲, প্রতি মাসে মাহীনা ৬৲ এবং ১০০৲ ফ্যাক্টরী ও কর্ম্মশালায় হাতেকলমে শিক্ষার জন্য ফী। বৃত্তি নাই।

অন্যান্য জ্ঞাতব্য—সংশ্লিষ্ট হোষ্টেলে থাকিবার বন্দোবস্ত আছে। ছাত্রদিগকে কঠোর পরিশ্রম করিতে হয়। সকাল নয়টা হইতে বেলা ৫টা পর্য্যন্ত কর্ম্মশালায় কাজ করিতে হয়; সন্ধ্যার পর পাঠের ক্লাস বসে। কলেজের সেক্রেটারীর নিকট আবেদন করিতে হয়।

দি ইণ্ডিয়ান অটোমোবাইল ইন্সটিটিউট্

(ঠিকানা—৭৫-৭৬ নং বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা)

উদ্দেশ্য—মোটর এঞ্জিনিয়ারিং সম্বন্ধে হাতে-কলমে জ্ঞান-দান।

শিক্ষণীয় বিষয়—এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে তিনটি স্বতন্ত্র শ্রেণী আছে। উচ্চতম শ্রেণী—Class A, মোটর ইঞ্জিনিয়ারিং ও তৎসংশ্লিষ্ট যন্ত্র-বিজ্ঞান সম্বন্ধে আদর্শগত ও ব্যবহারগত সর্ব্বপ্রকার শিক্ষা দেওয়া হয়। তন্নিম্নে—Class B, মোটর গাড়ীর কলকব্জা সম্বন্ধে নিখুঁত জ্ঞান

দেওয়া, তাহা খুলা, পরিষ্কার ও মেরামত করা সম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় শিখানো হয়; তৎসহ মোটরগাড়ী চালনাও শিখানো হয়। সর্ব্বনিম্ন শ্রেণী—Class C, কেবলমাত্র মোটরগাড়ী চালনা ও সামান্য মেরামতি-বিদ্যা শিখাইয়া দেওয়া হয়।

উপযুক্ততা—ক্লাস-Aতে কেবল ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করা কর্ম্মঠ ছাত্রদিগকে ভর্ত্তি করা হয়। অন্যান্য শ্রেণীতে সামান্য লেখাপড়া জানা থাকিলেই ভর্ত্তি হওয়া চলে।

সেসন ও শিক্ষার কাল—A-classয়ের সেসন প্রতি আগষ্টে আরম্ভ হয়। মেধাবী ছাত্রগণ এক বৎসরে কোর্স শেষ করিতে পারেন, নচেৎ দুই বৎসর লাগে। B class বৎসরে দুইবার আরম্ভ হয় ও ছয় মাসে কোর্স শেষ হয়। C-classয়ে যে কোন সময় ভর্ত্তি হওয়া যায় এবং শিক্ষা শেষ করিতে তিন মাসের বেশী সময় লাগে না।

মাহীনা—A ক্লাসের জন্য মোট্ মাহীনা ১৬০৲, B-ক্লাসের ১২৫৲ এবং C-ক্লাসের ৬৫৲। কোনো বৃত্তির বন্দোবস্ত নাই।

অন্যান্য জ্ঞাতব্য—সংশ্লিষ্ট হোষ্টেল নাই।

এখানকার A-class হইতে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া, বিলাতে উচ্চতর মোটর ইঞ্জিনিয়ারিং শিখিতে গেলে, অনেক সুবিধা পাওয়া যায়। প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারীর নিকট আবেদন করিতে হয়।

গভর্ণমেণ্ট কমার্শিয়াল ইন্‌ষ্টিটিউট

(২৮৫ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা)

উদ্দেশ্য—ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত বিশেষ বিশেষ বিদ্যায় পারদর্শী করিয়া তোলা। যাহারা এই সকল প্রতিষ্ঠানে নিম্ন স্তরে কার্য্য করিতেছে, তাহাদিগকেও অধিকতর উপযুক্ত করিয়া তোলা।

শিক্ষণীয় বিষয় ও শিক্ষার ধারা—এই শিক্ষালয়ে দুইটি কোর্স আছে। একটির নাম—The Day Course, অন্যটির নাম—The Evening Course. যাহারা ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়াছে, অথচ অফিসের কার্য্য-প্রণালী সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নাই, তাহাদিগের পক্ষে Day Course গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত। যাহারা আই-এ বা বি-এ পর্য্যন্ত পড়িয়াছেন এবং হিসাব-রক্ষণ সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করিয়াছেন

অথবা কোনো সরকারী বা আধা-সরকারী বিভাগে হিসাব-সেরেস্তায় কিছুদিন যাবৎ চাকুরী করিতেছেন, তাঁহাদের পক্ষে Evening Course গ্রহণ করা সঙ্গত।

"ডে কোর্স" (শিক্ষার কাল—২ বৎসর)

প্রথম বৎসর।

অবশ্যশিক্ষনীয় বিষয়সমূহ—(ক) ইংরাজী ভাষা, ইংরাজী চিঠিপত্র লিখন-পদ্ধতি ইত্যাদি; (খ) গণিত; (গ) যে-কোন ভারতীয় ভাষা-জ্ঞান; (ঘ) ব্যবসাগত ভূগোল; (ঙ) হিসাবরক্ষণ।

স্বেচ্ছাশিক্ষণীয় বিষয়—শর্টহ্যাণ্ড্ ও টাইপ্‌রাইটিং।

দ্বিতীয় বৎসর।

ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যবহারিক ও প্রয়োগ-মূলক উচ্চতর জ্ঞান দেওয়া হয়।

"ইভনিং কোর্স" (শিক্ষার কাল—সাধারণতঃ এক বৎসর; কেবল য়্যাকাউণ্টান্সি ও অডিটিং দুই বৎসর শিখিতে হয়।)

বিষয়সমূহ (যে-কোন একটি, দুইটি বা তিনটি বিষয় একসঙ্গে পড়া যায়)—

(ক) পলিটিক্যাল্ ইকনমির মূল সূত্র (খ) ব্যাঙ্কিং ও

কারেন্সি (গ) ব্যবসাগত আইন-কানুন্ (ঘ) য়্যান্নুইটী ও ইন্সিওরেন্স্ (ঙ) হিসাব-রক্ষণ (প্রাথমিক ও উচ্চতর) (চ) শর্টহ্যাণ্ড (ছ) টাইপরাইটিং (জ) আধুনিক ইংরাজী সাহিত্য (ঝ) য়্যাকাউন্ট্যান্সি ও অডিটিং।

সেসন—প্রতি বৎসর জুনের শেষে আরম্ভ হয় এবং প্রতি এপ্রিলে শেষ হয়। শর্টহ্যাণ্ড ও টাইপরাইটিং ক্লাসে ডিসেম্বরেও ছাত্রগণকে ভর্ত্তি করা হয়।

মাহীনা—ডে ক্লাসের প্রতি মাসে ৫৲, ভর্ত্তী ফী ৫৲, খেলার ফী বৎসরে ১৲, ষ্টেসনারী ফী বৎসরে ১৲ (কেবল মাত্র টাইপরাইটিং ক্লাসের ছাত্রদের জন্য)। ইভনিং ক্লাসের প্রতি মাসে প্রতি বিষয়ের জন্য ৩৲, প্রতি দুইটি বিষয়ের জন্য ৪৲, প্রতি তিনটি বিষয়ের জন্য ৬৲, খেলার ফী বৎসরে ১৲; ভর্ত্তির কোন ফী নাই।

বৃত্তি—ডে কোর্সের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শ্রেষ্ঠ তিনজন ছাত্রকে এক বৎসরের জন্য মাসিক ১২৲ করিয়া ও দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শ্রেষ্ঠ তিনজন ছাত্রকে এক বৎসরের জন্য মাসিক ২০৲ করিয়া বৃত্তি দেওয়া হয়।

অন্যান্য জ্ঞাতব্য—সংশ্লিষ্ট হোষ্টেল নাই। ইহা

সম্পূর্ণ গভমের্ণ্ট-পরিচালিত প্রতিষ্ঠান। প্রিন্সিপ্যালের নিকট আবেদন করিতে হয়।

বেঙ্গল এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ

(ঠিকানা—শিবপুর, জেলা হাওড়া)

শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ—স্বতন্ত্রভাবে (ক) সিভিল এঞ্জিনিয়ারিং (খ) মেকানিক্যাল ও ইলেক্ট্রিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং (গ) খনিবিদ্যা বা "মাইনিং"।

উপযুক্ততা— ক-বিভাগের জন্য বি-এস্‌সি বা আই-এস্‌সি পাশ হওয়া চাই ; খ ও গ-বিভাগের জন্য ম্যাট্রিকুলেশন্ বা আই-এসসি পাশ হইলে ভাল হয়।

সেসন-নভেম্বরের প্রথমে আরম্ভ ও আগষ্টের মাঝামাঝি শেষ। বিভিন্ন ক্লাসে দুই হইতে পাঁচ বৎসর পড়িতে হয়।

ফী ও বৃত্তি—বিভিন্ন বিভাগে বিভিন্ন প্রকারের ফী। বৎসরে ৩৬৲ হইতে ২৪০৲ পর্য্যন্ত ফী। হোষ্টেলের খরচ বৎসরে প্রায় ২০০৲। ৭২৲ হইতে ৬০০৲ পর্য্যন্ত নানা প্রকারের ৯৬টি স্কলারশিপ্ আছে।

অন্যান্য জ্ঞাতব্য—সম্পূর্ণ সরকারী প্রতিষ্ঠান। প্রত্যেক ছাত্রকে কলেজ-সংশ্লিষ্ট হোষ্টেলে থাকিতে হয়। অন্যান্য বিবরণের জন্য প্রিন্সিপ্যালের নিকট পত্র লিখিতে হয়।

ক্যালকাটা এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ

(ঠিকানা—পি. ১৫৬, লেক্ রোড্, কলিকাতা)

উদ্দেশ্য—অনেকটা উপরিউক্তরূপ। ওভারসিয়ার ও সাব্ ওভারসিয়ার এবং মেকানিক্যাল্ ও ইলেক্‌ট্রিক্যাল্ এঞ্জিনিয়ার, আর্কিটেক্ট ও বিল্ডিং এঞ্জিনিয়ার তৈয়ারী করা হয়।

উপযুক্ততা—যাহারা ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়াছে, তাহাদিগকে ওভারসিয়ার, সাব্ ওভারসিয়ার ক্লাসে ভর্ত্তি করা হয়। যাহারা পাশ করে নাই, তাহাদিগের এই বিদ্যালয়ের একটি বিশেষ টেষ্ট্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া প্রয়োজন। ম্যাট্রিক্, আই-এ ও আই-এস্‌সি পাশ ছাত্রদিগকে মেকানিক্যাল্ ও ইলেক্‌ট্রিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং ক্লাসে ভর্ত্তি করা হয়। ফেল্-করা ছাত্রদিগকে হেড মাষ্টার মহা-

শয় বিশেষ সার্টিফিকেট্ দিলে, ঐ সকল ক্লাসে ভর্ত্তি করা যাইতে পারে।

সেসন, মাহীনা ও শিক্ষার কাল—

সাব্ ওভারসিয়ার ও ওভারসিয়ার ক্লাসের সেসন আরম্ভ হয় প্রতি বৎসরের জানুয়ারী ও জুলাই মাসের মাঝামাঝি সময় এবং ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিংয়ের সেসন্ কেবল জুলাইয়ে। সাব ওভারসিয়ারি শিক্ষার কাল এক বৎসর; ওভারসিয়ারি শিক্ষার কাল দেড় বৎসর; মেকানিক্যাল ও ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার কাল তিন বৎসর।

সাব ওভারসিয়ার ক্লাসে ভর্ত্তি হইবার জন্য দরখাস্তের সহিত ১৫৲ পাঠাইতে হয়। ভর্ত্তি হওয়ার দিন আরও ২০৲ (একুনে ৩৫৲) ভর্ত্তি-ফী দিতে হয়। মাসিক মাহীনা ১৫৲ করিয়া। ওভারসিয়ার ক্লাসে ভর্ত্তি হইবার জন্য দরখাস্তের সহিত ২৫৲ ও ভর্ত্তি হইবার দিন ৪০৲ (একুনে ৬৫৲) ভর্ত্তি-ফী দিতে হয়। মাসিক মাহীনা ১৫৲ করিয়া। মেকানিক্যাল ও ইলেট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ক্লাশে ভর্ত্তি হইবার জন্য দরখাস্তের সহিত ২০৲ ও ভর্ত্তি হওয়ার দিন ৩৫৲ (একূনে ৫৫৲) ভর্ত্তি-ফী দিতে হয়। মাসিক মাহীনা ১৩৲ করিয়া। এই তিন বিভাগের প্রত্যেক ছাত্রকেই প্রতি মাসে ॥০ করিয়া খেলার ফী ও ইলেট্রিক্

চার্জ্জ ১৲ করিয়া দিতে হয়। তদুপরি ভর্ত্তির সময় ১০৲ করিয়া "Caution fee" জমা রাখিতে হয়।

অন্যান্য জ্ঞাতব্য—কেবলমাত্র ইলেক্‌ট্রিসিয়ান্ বা ইলেট্রিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং কোর্স'ও লওয়া চলে। প্রথমটির জন্য প্রায় এক বৎসরকালব্যাপী শিক্ষার ফী ১১০৲ লাগে। এই জাতীয় বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে এইটি নূতনতম হইলেও রীতিমত উল্লেখযোগ্য ও প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন। কিন্তু মাহীনা সাধারণ গৃহস্থের উপযোগী না হওয়ায় খুব জনপ্রিয় হইতে পারিতেছে না। অন্যান্য নিয়মাবলীপূর্ণ প্রস্পেক্টাস্-এর জন্য সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্টের নিকট ৵০ ডাক-টিকিট পাঠাইতে হয়।

গভর্মেণ্ট উইভিং ইন্‌স্‌টিটিউট

(ঠিকানা—শ্রীরামপুর, জেলা হুগ্‌লী)

উদ্দেশ্য—উন্নত ধরণের হাতের তাঁত গঠন, মেরামত ও চালন এবং নানারূপ বয়ন-বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া। দুইটি বিভাগ আছে :—(ক) একটু শিক্ষিত ও বয়স্ক ব্যক্তিদিগের জন্য—যাঁহারা নানা বয়ন-প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ,

পরিচালক ও শিক্ষক হিসাবে কার্য্য করিবার নিমিত্ত একটু উচ্চতর বিদ্যা অধিগত করিতে চাহেন। (খ) যাহারা সাধারণ কারিগর শ্রেণী-রূপে তৈয়ারী হইতে চাহেন।

উপযুক্ততা—উচ্চতর শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইবার জন্য অন্ততঃপক্ষে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া চাই, অথবা সাব্-ওভারসিয়ারী পর্য্যন্ত পড়া হইলে ভাল হয়। যাহাদের তাঁতিগিরি পেশা, সাধারণতঃ কারিগর-শ্রেণীতে তাহাদিগকেই ভর্ত্তি করা হয়। ইহাতে বিশেষ লেখাপড়া জানার দরকার করে না।

সেসন ও শিক্ষাকাল—উচ্চতর শ্রেণীর সেসন আরম্ভ হয় প্রতি বৎসরের জুলাই মাসের তৃতীয় সপ্তাহে। শিক্ষার কাল তিন বৎসর। নিম্নতন শ্রেণীর সেসন আরম্ভ হয় জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহে। শিক্ষার কাল এক বৎসর মাত্র।

মাহীনা ও বৃত্তি—মাহীনা লাগে না, কেবল ভর্ত্তি হইবার সময় ২৲ ফী দিতে হয়। উচ্চতর কোর্সে প্রথম বৎসর হইতেই ১৫৲ করিয়া মাসে অনেকগুলি বৃত্তি আছে। কারিগর শ্রেণীর জন্য মাসে ৬৲ করিয়া পাঁচিশটি বৃত্তির ব্যবস্থা আছে।

অন্যান্য জ্ঞাতব্য—হোষ্টেলে ৬০ জন হিন্দু,

৩০ জন মুসলমান্ এবং ২০ জন খ্রীষ্টান ছাত্রের উপযুক্ত স্থান আছে। অন্যান্য বিষয়ের জন্য প্রিন্সিপ্যালের নিকট আবেদন করিতে হয়।

কাঁচরাপাড়া টেকনিক্যাল স্কুল

(Kanchrapara, E. B. Ry)

উদ্দেশ্য—কারখানাসমূহে শিক্ষানবীশগণ যাহাতে উপযুক্তরূপ শিক্ষিত হইয়া মাঝামাঝি দায়িত্বের কাজগুলি গ্রহণ করিতে পারে এবং এই স্কুল হইতে শিক্ষা সমাপনান্তে কিছু দিন শিবপুরে পড়িয়া মেক্যানিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যায় পারদর্শী হইতে পারে।

শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ-(১) ফলিত গণিত (২) রসায়ণ (৩) যন্ত্রবিজ্ঞান (৪) বিভিন্ন বস্তুসমূহের শক্তি (৫) মেশিন ড্রয়িং ও ডিজাইন্ (৬) বাষ্পীয় ইঞ্জিন্ ও তাপজনক ইঞ্জিন (৭) তাড়িৎ-বিজ্ঞান ও ম্যাগ্নেটিজ্ম্ (৮) তাড়িৎজনিত এঞ্জিনিয়ারিং। সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্র ফিট্ করা, বয়লার তৈয়ারী করা, রেলওয়ে ও গাড়ীমালগাড়ী তৈয়ারী করা, ইলেক্ট্রিক্ যন্ত্রাদি নাড়া-

চাড়া ও মেরামত করা এবং অন্যান্য যন্ত্রগত ব্যবহারিক জ্ঞান দান করা হয়।

উপযুক্ততা—ম্যাট্রিকুলেশন পাশ বা আই-এস সি পর্য্যন্ত পড়া হইলে ভাল হয়; বর্ত্তমানে অনেক বি-এস্‌সিও প্রবেশ করিতেছেন। কিন্তু ভর্ত্তি হইবার সময় Apprentice Admission Examination নামক বিশেষ পরীক্ষায় প্রত্যেক ছাত্রকে উত্তীর্ণ হইতে হয়।

সেসন ও শিক্ষার কাল—প্রতি জানুয়ারীতে য়্যাপ্রেন্টিস্‌শিপ পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। ছয় বৎসরে কোর্স শেষ হয়। শেষ দুই বৎসর শিবপুর বেঙ্গল এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়িতে হয়।

মাহীনা ও বৃত্তি—মাহীনা দিতে হয় না। প্রত্যেক শিক্ষানবীশকে 'জলপানি' দেওয়া হয়। মাসে চল্লিশ টাকা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া বৃত্তি ৭৫৲ পর্য্যন্ত হয়।

অন্যান্য জ্ঞাতব্য—সরকারী প্রতিষ্ঠান; ছাত্রদের জলপানির টাকা ই, বি, রেলওয়ে কোম্পানী যোগান্। স্কুল-সংলগ্ন হোষ্টেলে ৪০ জন ভারতীয় ছাত্র থাকিবার বন্দোবস্ত আছে। সেক্রেটারীর নিকট নিয়মাবলী ও ও অন্যান্য বিবরণের জন্য পত্র লিখিতে হয়।

য়্যাপ্রেন্টিসেস্ টেকনিক্যাল স্কুল

(ঠিকানা -Lillooah, Howrah, E. I. R.)

উদ্দেশ্য ও শিক্ষণীয় বিষয়—অনেকাংশে কাঁচরাপাড়া টেক্‌নিক্যাল স্কুলের মত।

সেসন ও শিক্ষার কাল জানুয়ারীতে আরম্ভ; পাঁচ বৎসর কাল।

অন্যান্য জ্ঞাতব্য শিক্ষা করিবার ফী দিতে হয়। হোষ্টেল নাই; বৃত্তি নাই। অন্যান্য বিষয়ের জন্য হেড মাষ্টারের নিকট পত্র লিখিতে হয়।

বেঙ্গল কলেজ অব্ এঞ্জিনিয়ারিং য়্যাণ্ড, টেক্‌নোলজি

(ঠিকানা—যাদব র, ২৪ পরগণা)

উদ্দেশ্য—ফলিত ও যান্ত্রিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে ভাবগত ও ব্যবহারি শিক্ষা দিয়া, যুবকদিগকে সুষ্ঠুভাবে জীবিকা-নির্ব্বাহের সুযোগ করিয়া দেওয়া।

শিক্ষণীয় বিষয়—সূত্রধরের কাজ, ঢালাই ও লোহালক্কড়ের কাজ, মেসিন্ শপ্ ও ফিটিংয়ের কাজ, মেকানিক্যাল ও ইলেক্‌ট্রিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি।

উপযুক্ততা—ম্যাট্রিকুলেশন পর্য্যন্ত পড়া অথবা পাশ-করা হইলে ভাল হয়। আজকাল অনেকে আই-এ ও আই-এস-সি পর্য্যন্ত পড়িয়াও প্রবেশ করিতেছেন।

সেসন—১লা জুলাই হইতে আরম্ভ হয়। বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা-কালের তারতম্য আছে।

অন্যান্য জ্ঞাতব্য—বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে এইটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট, সর্ব্বপুরাতন, সর্ব্ববৃহৎ ও সুপরিচালিত। প্রতিমাসে মাহীনা ৬৲—৪৲। কলেজসংশ্লিষ্ট হোষ্টেলে স্থান পাওয়া যায়। কলিকাতা হইতে রেলে ৯।১০ মিনিটের রাস্তা। নিয়মাবলীর জন্য সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের নিকট আবেদন করিতে হয়।

মেক্যানিক্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, কৃষ্ণনাথ কলেজ

(ঠিকানা—বহরমপুর, মুর্শীদাবাদ)

উপযুক্ততা—ম্যাট্রিকুলেশন্ পর্য্যন্ত পড়া বা পাশ-করা ছাত্র ভর্ত্তি হইতে পারে।

সেসন—জুলাই মাসে আরম্ভ হয়; দুই বৎসরে কোর্স শেষ হয়।

মাহীনা—প্রতি মাসে ৬৲ করিয়া।

অন্যান্য জ্ঞাতব্য—৫০ জন ছাত্রের হোষ্টেলে থাকিবার ব্যবস্থা আছে। অন্যান্য বিষয়ের জন্য এই বিভাগের সুপারিনূটেণ্ডেন্টের নিকট পত্র লিখিতে হয়।

আসানুল্লা স্কুল অব্ এঞ্জিনিয়ারিং

(ঠিকানা—রমনা, ঢাকা)

উদ্দেশ্য—পাবলিক ওয়ার্কস্ ডিপার্টমেণ্ট, ডিষ্ট্রিক্ট্ বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি ও অন্যান্য আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের জন্য আপার সাবড়্ডিনেট্ কর্ম্মচারী, ওভারসিয়ার ও সাব্ ওভারসিয়ার তৈয়ারী করা। বাংলা দেশে আপার সাব্ড়ডিনেট প্রস্তুত করার একমাত্র সরকারী বিদ্যালয়।

শিক্ষণীয় বিষয়—বীজগণিত, পরিমিতি-শাস্ত্র, ত্রিকোণমিতি, যন্ত্র-বিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান, রেলওয়ে ইরিগেশন, জল-সরবরাহ-প্রণালী, স্যানিটারী ইঞ্জিনিয়ারিং, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, সার্ভেয়িং, য়িং, ব্যবহারিক জ্যামিতি, হিসাব-রক্ষণ ইত্যাদি।

উপযুক্ততা—ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় যাঁহারা প্রথম ডিভিশনে পাশ করিয়াছেন, তাঁহারা আপার সাব্ডিনেট্ (ওভারশিয়ার) কোর্সে ভর্ত্তি হইতে পারেন। আই-এস্সি পর্য্যন্ত পড়া বা পাশ-করা হইলে অধিকতর গ্রাহ্য হয়। যাঁহারা ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়াছেন, অথবা ইংরাজী ও অঙ্কশাস্ত্রে পাশ-নম্বর রাখিয়াছেন, তাঁহারা সাব্-ওভারসিয়ারি কোর্সে ভর্ত্তি হইবার উপযুক্ত।

মাহীনা ও বৃত্তি—প্রতি মাসে ৫৲ করিয়া। বিভিন্ন রকমের অনেকগুলি বৃত্তি আছে। দরিদ্র ও মুসলমান ছাত্রদিগের জন্য কয়েকটি বিশেষ বৃত্তির বন্দোবস্ত আছে।

সেসন্ ও শিক্ষা-কাল—প্রতি বৎসর জুলাই মাসের প্রথমে সেসন আরম্ভ হয়। ওভারশিয়ার-কোর্স চারি বৎসরে ও সাব্ওভারসিয়ার কোর্স দুই বৎসরে শেষ হয়।

অন্যান্য জ্ঞাতব্য—স্কুল-সংশ্লিষ্ট হোষ্টেলে দুই শত হইতে আড়াই শত ছাত্র স্থান পাইতে পারে। প্রিন্সি-প্যালের নিকট আবেদন করিতে হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বলা বাহুল্য, বঙ্গদেশের সামান্য কয়েকটি প্রসিদ্ধ শিক্ষায়তনের পরিচয় এস্থানে দেওয়া হইল। বাংলার প্রায় প্রত্যেক জেলা-শহরেই একটী-না-একটী ব্যবসা-বাণিজ্য-শ্রমশিল্প, ও কৃষি-বিদ্যা শিক্ষা করিবার বিদ্যালয় আছে। এতৎসঙ্গে পাব্‌না শহরের "ইলিয়ট্ বনমালী টেক্‌নিক্যাল স্কুল," রাজশাহী শহরের "ডায়মণ্ড জুবিলী ইন্‌ডাষ্ট্রীয়াল স্কুল কুমিল্লার ইলিয়ট্ টেক্‌নিক্যাল স্কুল" প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রত্যেক স্কুলের সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্টের নিকট পত্র লিখিলে আইন-কানুনসমূহ জানা যায়। উপরিলিখিত তিনটি স্কুলেই ছাত্রবৃত্তির ব্যবস্থা আছে।

অর্থের সন্ধান—



স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি

স্বকৃতকর্ম্মার জীবন-গীতা

সার রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ২৪ পরগণা জেলার বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত ভবলা নামক ক্ষুদ্র পল্লীতে এক সমুচ্চ ব্রাহ্মণ বংশে রাজেন্দ্রনাথের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা ৺ভগবানচন্দ্র মুখার্জ্জি বারাসতে মোক্তার ছিলেন। ব্যবসায়ে যাহা কিছু আয় হইত, তদ্দ্বারা তিনি তাঁহাদের বিশাল একান্নভুক্ত পরিবার প্রতিপালন করিতেন।

রাজেন্দ্রনাথের বয়স যখন সাত কি আট, তখন তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। একমাত্র উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তির মৃত্যুতে সংসারের অবস্থা যে কি শোচনীয় হইয়া পড়িল, তাহা সহজেই অনুমেয়। যাহা হউক, রাজেন্দ্রনাথকে কোন প্রকারে গ্রাম্য পাঠশালায় ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইল। অতঃপর তিনি ইংরাজী শিক্ষার জন্য বালিগঞ্জে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র চন্দ্রকুমারের নিকট গমন করেন। কিছুদিন পরে এখানে বসন্তের প্রাদুর্ভাব হওয়ায় তাঁহাকে দেশীয় নিয়মানুসারে টীকা দেওয়া হয়। ইহাতে তাঁহার প্রায় জীবন-সংশয় হইয়া পড়িয়াছিল।

অবশেষে বহু কষ্টে আরোগ্য লাভ করিয়া, তিনি আবার দেশে ফিরিয়া আসেন। এই সময় তিনি সাঁতার কাটা, মাছ-ধরা এবং অন্যান্য বালসুলভ খেলাধূলা লইয়াই প্রায় মাতিয়া থাকিতেন। তাঁহার বিধবা মাতা কিন্তু আর্থিক ও মানসিক নানাবিধ অস্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে থাকিয়াও পুত্রের বিদ্যা-শিক্ষার সদুপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

৺ভগবানচন্দ্র মুখার্জ্জি জীবিতাবস্থায় জয়গোপাল মুখার্জ্জি নামে একটী ছেলেকে পড়াশুনার জন্য অর্থ-সাহায্য করিতেন; তাঁহাকে তিনি একটী চাকুরীও যোগাড় করিয়া দিয়াছিলেন। রাজেন্দ্রনাথের মাতা একদিন পুত্রকে লইয়া জয়গোপাল বাবুর নিকট উপস্থিত হইলেন। অতঃপর রাজেন্দ্রনাথ বারাসতে আসিয়া তাঁহারই তত্ত্বাবধানে স্কুলে পড়াশুনা করিতে আরম্ভ করেন।

সে'বার তাঁহার দ্বিতীয় শ্রেণী। পড়াশুনা যথারীতি চলিতেছিল। কিন্তু এই সময় তিনি আবার ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হন। ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া পড়াশুনা করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল; সুতরাং তিনি আবার নিজ পল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পুত্রের মঙ্গলের জন্য মাতার উৎ-কণ্ঠার আর অবধি রহিল না। শেষে ডাক্তারের উপদেশ অনুযায়ী তিনি রাজেন্দ্রনাথকে আগ্রায় তাঁহার ভ্রাতা

পণ্ডিত দ্বারকানাথের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। এই সময় ১২ কি ১৩ বৎসরের বালক, একমাত্র চাকর সমভিব্যাহারে সমস্ত পথকষ্ট অগ্রাহ্য করিয়া, পায়ে হাঁটিয়াই ভবলা হইতে বারাকপুর পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। বারাকপুরে তাঁহার মাতুল (বিমাতার ভাই) যোগেশচন্দ্র গাঙ্গুলী তাঁহাকে বিশেষ আদর-যত্ন করিলেন ; তারপর কয়েকদিন সেখানে থাকিয়া, রাজেন্দ্রনাথ আগ্রায় চলিয়া যান।

আগ্রায় রাজেন্দ্রনাথ তিন বৎসরকাল ছিলেন। এখানে বিশ্ববিশ্রুত তাজমহল তাঁহার কিশোর ভাবপ্রবণ চিত্তকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। তাজের অম্লান সৌন্দর্য্য এবং অদ্ভুত রচনা-কৌশল দেখিয়া তাঁহার স্থাপত্য-বিদ্যার উপর প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মে। এই অনুরাগই পুষ্ট ও পরিণত হইয়া, পরবর্ত্তী জীবনে তাঁহাকে কলিকাতা নগরীতে "ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধ" নির্ম্মাণে সহায়তা করিয়াছে।

আগ্রায় সেন্ট্‌জেমস্ স্কুলে এণ্ট্রান্স ক্লাশে পড়িবার বৎসরে তাঁহার বিবাহ হয়; অতঃপর তিনি ভবানীপুরস্থ L. M. S. Institution হইতে এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া, প্রেসিডেন্সি কলেজের Engineering বিভাগে ভর্ত্তি হন। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন

উপাধি-পত্র (Diploma) পাইবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে পড়াশুনা ছাড়িয়া দিতে হইল। অতঃপর তিনি ভগ্নস্বাস্থ্য অথচ তরুণ আশাদীপ্ত মন লইয়া, অর্থের সন্ধানে বাহির হইলেন।

প্রথমে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র যোগেশচন্দ্র মুখার্জ্জি তাঁহাকে একটী চাকুরী স্থির করিয়া দিয়াছিলেন ; কিন্তু উহা তাঁহার মনঃপূত না হওয়ায় তিনি গ্রহণ করিলেন না। অবশেষে তিনি কলিকাতায় আসিয়া, একটি অনাথ বালিকা-বিদ্যালয়ে দৈনিক দুই ঘণ্টা কাল অধ্যাপনার কার্য্যে নিযুক্ত হন। ইহাতে যে ১৫টী টাকা পাইতেন, তদ্দ্বারা তাঁহার কোনও প্রকারে মেসের খরচ-পত্র নির্ব্বাহ হইত।

এই সামান্য কাজে নিযুক্ত থাকিয়াও তিনি তাঁহার জীবনের মহৎ আদর্শ ভুলিয়া যান নাই। অহোরাত্র কলিকাতার পথ চলিতে, বিশাল গগনস্পর্শী সৌধমালা তাঁহার মন যেন মন্ত্র-মুগ্ধ করিত। তিনি উহাদের প্রত্যেকটীর রচনা-কৌশল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিতেন এবং প্রকৃত স্থপতির ন্যায় উহাদের উপাদান-গুলির বিভিন্নরূপ ব্যবহারে ও বিন্যাসে কি ফল হইতে পারে, তাহা মনে মনে হিসাব করিয়া দেখিতেন।

মেসে থাকাকালীন রাজেন্দ্রনাথের রামব্রহ্ম সান্যাল

নামে জনৈক মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রের সঙ্গে পরিচয় হয়। সান্যাল মহাশয় কিছুদিন পরে আলিপুর চিঁড়িয়াখানার সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হন। রাজেন্দ্রনাথ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য প্রায়ই আলিপুর যাতায়াত করিতেন। তথায় একদিন ঘটনাচক্রে হুগলী সেতুর উদ্ভাবন-কর্ত্তা Sir Bradford Leslieর সহিত তাঁহার পরিচয় হইয়া যায়। এই Leslie সাহেবের সাহায্যেই তিনি কিছুদিন পরে Palta Water Worksএ সামান্য কিছু Contractএর কাজ পাইলেন। অতঃপর ঐ কাজ শেষ হইয়া গেলে, Paltaর Supervising Engineer Mr. Fenwick তাঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে কারখানার সংরক্ষণ-কার্য্যে (maintainance work) নিযুক্ত করেন। এই সকল কার্য্য নিষ্পন্ন করিবার জন্য তিনি তাঁহার বন্ধু দেবেন্দ্রনাথ সেনের নিকট হইতে ১০০০৲ টাকা এবং তাঁহার মাতুলের জামিনে অপর এক ভদ্রলোকের নিকট হইতে ৫০০০৲ টাকা ধার করিয়াছিলেন।

কিছুদিন পরে Mr. Fenwickএর সঙ্গে রাজেন্দ্রনাথের মতান্তর হওয়ায় তাহার কর্ম্মচ্যুতি ঘটে। অতঃপর তিনি কুষ্টিয়া, মাগুরা, রাণাঘাট প্রভৃতি স্থানে কিছু

কিছু ঠিকাদারি কাজ করেন। কিন্তু এই সকল কার্য্যে তাঁহার বিশেষ লাভ হইল না। এদিকে রাজেন্দ্রনাথ কর্ম্ম ছাড়িয়া দেওয়ার পর পলতার কারখানায় নানারূপ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল। শেষে নানা দুশ্চিন্তার মধ্যে একদিন Mr. Fenwick তাঁহাকে ডাকিয়া আনিয়া, পুনরায় পূর্ব্বপদে নিযুক্ত করিলেন।

Paltaর কাজে তাঁহার যথেষ্ট অবসর থাকিত। এই জন্য তিনি ভূতনাথ মুখার্জ্জির সহিত মিলিত হইয়া T. C. Mookerjee & Co. নামে একটী আফিস গঠন করেন এবং নানা স্থানে ঠিকাদারি-কার্য্য করিতে থাকেন। তন্মধ্যে হুগলির আদালত-গৃহ নির্ম্মাণ, Corporationএর সঙ্কল্প-অনুযায়ী Palta হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত ৪০ ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত জলের পাইপ বসান, Palta Water Works-এ Filter এবং Settling tanksএর সংখ্যা দ্বিগুণ করিবার সময় উহাদের প্রকাণ্ড বাটী নির্ম্মাণ প্রভৃতি কার্য্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অতঃপর যুক্ত প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট বিভিন্ন শহরে কতকগুলি জলের কল স্থাপন করিবার সঙ্কল্প করেন। T. C. Mookerjee. & Co Agra Water Worksএর জন্য সর্ব্বনিম্ন হারে টেণ্ডার দাখিল করিয়াও ঐ কার্য্য পাইলেন

না। ইহার কারণ আর কিছুই নহে; T. C. Mookerjee & Co একটী ভারতীয় প্রতিষ্ঠান। এই কারণে যুক্ত-প্রদেশের তদানীন্তন Special Water Worksএর এঞ্জিনিয়ার A. J. Hughes সাহেব তাঁহাকে অদূর ভবিষ্যতে কোনও ইউরোপীয়ের সঙ্গে একযোগে কাজ করিতে উপদেশ দেন। তদনুযায়ী তিনি Walsh & Lowett & Coর Aquin Martin সাহেবের সহিত,কাজের এক তৃতীয়াংশ লভ্যাংশ গ্রহণের সর্ত্তে, একযোগে এলাহাবাদ Water Worksএর জন্য tender দাখিল করেন। এই সময় এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে. যাহাতে রাজেন্দ্রনাথের অসীম অধ্যবসায় এবং অসাধারণ কার্য্য-দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। Tender দাখিল করার দিন ১০টার সময় দেখা গেল, এষ্টিমেট্ সংক্রা[illegible] সমস্ত কাগজ-পত্র চুরি হইয়া গিয়াছে। অথচ সময় মাত্র [illegible]টা পর্য্যন্ত, শেষে Hughes সাহেবের নিকট হইতে [illegible] ৫টা পর্য্যন্ত সময় মঞ্জুর করাইয়া, Martin এবং [illegible]ন্দ্রনাথ প্রায় দুই ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত কাগজপত্র নূত[illegible]রিয়া প্রস্তুত করিয়া ফেলিলেন।

ইহার পর [illegible]বেও পূর্ব্বোক্ত চুক্তিতে কাজ সংগ্রহ করা হইল। [illegible]ময় Walsh & Lowett & Coর Lowett সা[illegible]তে পদার্পণ করেন। রাজেন্দ্রনাথের

মত একজন কৃষ্ণাঙ্গকে কোম্পানীর এইরূপ মোটা লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে দেখিয়া, তিনি Martin সাহেবের উপর বিশেষ অসন্তুষ্ট হন। শেষে তাঁহার সহিত মতান্তর হওয়ায় Martin সাহেব কোম্পানীর পদত্যাগ করিলেন।

১৮৯২ খৃষ্টাব্দে রাজেন্দ্রনাথ এবং Martin সাহেব এক যোগে Martin & Co নামে অধুনা-প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। ব্যবসায়ের লাভ-লোকসানের অংশ উভয়েরই সমান রহিল। ইহাতে ইউরোপীয় ব্যবসায়ী-মহলে মহা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। কিন্তু রাজেন্দ্রনাথ এবং Aquin Martin উভয়েই পাকা লোক এবং আত্ম-ক্ষমতায় একান্ত বিশ্বাসবান। সুতরাং নানা বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও তাঁহারা ক্রমেই উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া চলিলেন। যুক্তপ্রদেশের গভর্মেণ্ট তাঁহাদের কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া, মীরাট, নাইনিতাল, বেনারস, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি শহরের বহু লক্ষ টাকার নির্ম্মাণ-কার্য্যের ভার Martin & Coর হাতেই ন্যস্ত করেন।

অতঃপর রাজেন্দ্রনাথ T. C. Mookerjee & Coর সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া, Martin & Coর কাজেই সমস্ত সময় ও শক্তি নিয়োগ করিলেন। কিছুকাল পরে Water Worksএর কাজে খুব মন্দা পড়িয়া গেল। কিন্তু

রাজেন্দ্রনাথ ইহাতে বিচলিত না হইয়া, উপার্জ্জনের নূতন পন্থা উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হইলেন। এখানে তাঁহার সাহস, ধৈর্য্য এবং মস্তিষ্ক পরিচালন-শক্তির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

তিনি দেখিলেন যে, আমাদের দেশে প্রধান রেল লাইনগুলির সঙ্গে কতকগুলি ছোট ছোট Feeder line জুড়িয়া দিলে, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং লোক-যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা হয়। গভর্ণমেণ্ট তাঁহার এই প্রস্তাব সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করেন। ইহার ফলে, গভর্ণমেণ্টের সহযোগিতা লাভ করিয়া, Martin & Co দেশে কতকগুলি Feeder line নির্ম্মাণ করিলেন। 'মার্টিনের ছোট রেল্' শুধু বাঙ্গালায় নহে, ভারতেও সুপরিচিত। কিন্তু এখানেও আবার বাধা। কলিকাতার কতিপয় প্রতিপত্তিশালী ইউরোপীয় ব্যবসায়ী ঈর্ষা-পরবশ হইয়া, গভর্ণমেণ্টকে এই পন্থা হইতে বিরত করেন।

রাজেন্দ্রনাথ ইহাতেও বিশেষ নিরুৎসাহ হইলেন না। তিনি আবার নূতন উদ্যমে স্থাপত্যকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। ফলে Martin & Coর দ্বারা কলিকাতার Mysore Memorial, Esplanade Mansion, Tipperah Palace, Chartered Bank Buildings এবং অন্যান্য অনেকগুলি বিশাল অট্টালিকা নির্ম্মিত হয়।

কিন্তু Victoria Memorial নির্ম্মাণই রাজেন্দ্রনাথের কর্ম্মজীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি এবং নূতন Bengal Legislative Council House তাঁহার অপূর্ব্ব স্থাপত্য-প্রজ্ঞানের পরিচয়।

সামান্য অবস্থা হইতে জীবনযাত্রা আরম্ভ করিয়া, সার রাজেন্দ্রনাথ আপন প্রতিভা ও কর্ম্ম-শৌর্য্যের গুণে উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করিয়াছেন। আজ তিনি ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনী ব্যবসায়ীদিগের অন্যতম। কোটি কোটি মুদ্রা উপার্জ্জন করিয়া, তিনি বিলাসাতিশয্য, আত্মাভিমান ও আত্মবিস্মৃতিময় আলস্যের অতল সলিলে ডুবিয়া যান্ নাই। বাণপ্রস্থ-আশ্রমের বয়স বহুদিন অতিক্রম করিলেও এখনও তিনি কর্ম্মী, এখনও তিনি ব্যবসায় সুপরিচালনার জন্য নিত্য-নূতন চিন্তা ও পরিকল্পনায় নিমগ্ন থাকেন। শুধু তাহাই নহে, সদাসর্ব্বদা রাজকর্ম্মচারী ও ইউরোপীয়দের সংস্পর্শে থাকিয়াও তাঁহার স্বদেশী মনোবৃত্তির বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই। স্বদেশবাসীর দারিদ্র্য-দুঃখ দূর করিতে, স্বগ্রাম ও স্ব-মহকুমার শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান করিতে, এই স্বকৃতকর্ম্মা মহাপুরুষ আপন উদার হৃদয় ও অনুকূল হস্তমুষ্টি সর্ব্বদা উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন।

সার রাজেন্দ্রনাথ আজ পৃথিবী-পরিচিত, দেশের সর্ব্বত্র সমাদৃত। গবর্ণমেণ্টও তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে নানাবিধ উচ্চ সম্মানে ভূষিত করিয়াছেন। তাঁহার সুযোগ্যা সহধর্ম্মিণী লেডী যাদু মুখার্জ্জি অসাধারণ দয়াশীলা পুণ্যবতী মহিলা। তাঁহার চরিত্র-গুণে রাজেন্দ্রনাথের আজ শান্তিময় সোণার সংসার।

হেন্‌রী ফোর্ড

জীবনে উন্নতি এবং সাফল্যলাভ করিতে হইলে, লক্ষ্য সর্ব্বদাই উচ্চে রাখিতে হয়,—বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ী হেন্‌রী ফোর্ডের অদ্যাবধি জীবন-বৃত্তান্ত পাঠ করিলে, আমরা ইহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাই।

কর্ম্মবীর হেন্‌রী ফোর্ড আমেরিকায় মিশিগান রাজ্যের অন্তর্গত Detroit নগরের নিকটবর্ত্তী Greenfield নামক স্থানে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা একজন প্রসিদ্ধ কৃষি-ব্যবসায়ী ছিলেন এবং সমাজে তাহার প্রতিপত্তিও যথেষ্ট ছিল। তাঁহার পিতা স্বীয় ব্যবসায়ে যে সকল যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিতেন, বালক

হেন্‌রী সর্ব্বদা সেগুলির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরীক্ষা এবং চালনা-প্রণালী লক্ষ্য করিতেন। এইরূপ পর্য্যবেক্ষণের ফলে তিনি অতি অল্প বয়সেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, উন্নততর যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন করিতে পারিলে, লোকের দৈহিক পরিশ্রমের বহুল পরিমাণে লাঘব হয়। ফলে, মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল-বিধানে বিশেষ সহায়তা করা যায়। তাঁহার এই মনোবৃত্তির পরিণতি দেখিয়া, জগৎ আজ বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে।

লেখা-পড়া শিখিবার জন্য তিনি বাল্যকালে এক স্কুলে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন বটে ; কিন্তু এখানে শিক্ষা তাঁহার যৎ-সামান্যই হইল। তাঁহার চিত্ত যেন সর্ব্বদাই কলকারখানার আশেপাশে ঘুরিয়া বেড়াইত। স্কুলে পড়িবার সময় তিনি একদিন স্বহস্তে একটী জলপ্রবাহ-চালিত যন্ত্র নির্ম্মাণ করেন। অতঃপর তাঁহার ঘড়ি-নির্ম্মাণ-প্রণালী শিক্ষা করার ইচ্ছা হয়। এই উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহার পিতৃদত্ত ঘড়ি-টীর বিভিন্ন অংশগুলি খুলিয়া, আবার তাহাদিগকে যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সে চেষ্টা কয়েক দিনের মধ্যেই ফলবতী হইল। আর একদিন একটী অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। জলপূর্ণ পাত্রের মুখ বন্ধ করিয়া আগুনের উপর রাখিলে কি ফল দাঁড়ায়, একদিন

অর্থের সন্ধান—



হেনরী ফোর্ড

হেনরী তাহা পরীক্ষা করিতেছিলেন। কিছুকাল পরে পাত্রটী সশব্দে ভাঙ্গিয়া চুর্‌মার্‌ হইয়া গেল এবং দুই এক খানা টুকরা হেনরীর গাত্রে আসিয়া পড়িল। এইরূপে তাঁহার বিজ্ঞান-শাস্ত্রে দীক্ষা আরম্ভ হয়।

যন্ত্র-নির্ম্মাণ শিক্ষার অভিলাষ তাঁহার ক্রমেই বাড়িয়া চলিল, যেন ইহা তাঁহার জন্মগত অধিকার। তাঁহার পিতা পুত্রের এই প্রকার মনোবৃত্তি দেখিয়া মোটেই সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। তিনি ঘোরবিষয়ী ছিলেন, সুতরাং স্বভাবতঃ তাহার মনে হইল যে, ছেলে অপদার্থ হইয়া যাইতেছে। শেষে তিনি একদিন স্পষ্টই হেনরীকে বলিতে বাধ্য হইলেন যে, এরূপ অকর্ম্মণ্য ছেলেকে তিনি গৃহে স্থান দিতে পারেন না; সে যেন তাহার নিজের পথ খুঁজিয়া লয়।

অভিমানী বালক ১৫ বৎসর বয়সে পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া, Detroit নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, সঙ্গে টাকাকড়ি যৎসামান্যই ছিল, তথাপি তাঁহার উৎসাহের অভাব ছিল না। তাহার দৃঢ় বিশ্বাস যে, সাধনার বলে তিনি তাঁহার জীবনের স্বপ্ন নিশ্চয়ই একদিন কার্য্যে পরিণত করিতে পারিবেন, আর Detroit তাহার উপযুক্ত স্থান। কেননা শহরটী কলকারখানায় পরিপূর্ণ।

একদিন কাজের খোঁজে তিনি কোনও দোকানে গিয়া

উপস্থিত হন। কার্য্যাধ্যক্ষ কিছুক্ষণ এই কর্ম্মপ্রার্থী যুবক-টিকে বিশেষভাবে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার মুখে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ভাব সুস্পষ্ট আঁকা রহিয়াছে। অতঃ-পর তাঁহার সঙ্গে দুই একটী কথা কহিয়া, তিনি বিশেষ সন্তোষ লাভ করিলেন। হেনরীর একটি অতি ছোট রকমের চাকরা (office-boy) হইল ; বেতন সাপ্তাহিক আড়াই ডলার (প্রায় আট টাকা) মাত্র।

উপরিউক্ত আয়ে সুযোগ্য বসবাসের স্থান এবং খাওয়া পরার ব্যয় সঙ্কুলান হইবে না বুঝিয়া, তিনি রাত্রিকালে কোনও ঘড়ির দোকানে মেরামতি কাজ আরম্ভ করিলেন। কিছুদিন পরে এই দুইটি কর্ম্মস্থলেই তাঁহার বেতন-বৃদ্ধি হইল। এই সময় তিনি অবসর পাইলেই Engineering এবং যন্ত্রবিজ্ঞান বিষয়ক নানাবিধ পুস্তক-পুস্তিকা অভি-নিবেশ সহকারে পাঠ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইহাতে তাহার অন্তরের প্রবল জ্ঞানতৃষ্ণা নিবৃত্ত হইল না। তিনি দেখিলেন যে, লক্ষ্যস্থানে পৌঁছিতে হইলে, তাঁহার আরও উচ্চাঙ্গের ব্যবহারিক শিক্ষার প্রয়োজন। এই অভিপ্রায়ে তিনি কর্ম্মত্যাগ করিয়া, সাপ্তাহিক আড়াই ডলার জল-পানিতে Edison কোম্পানীর কারখানায় শিক্ষানবীশ হইয়া প্রবেশ করেন। শেষে বিরাট অধ্যবসায় এবং

অসাধারণ প্রতিভার বলে তিনি এখানে প্রধান Engineer এর পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

Henry Ford জীবনে একদিনেই উন্নতিলাভ করেন নাই। তাঁহার অদ্ভুত কীর্ত্তি তাহার আজীবন সাধনার ফল। বহু গবেষণা ও পরীক্ষণের পর, ৩৯ বৎসর বয়সে (১৮৯২ খৃষ্টাব্দে) তাঁহার স্বনামধন্য Ford Car প্রথম নির্ম্মিত হয়।

পূর্ব্বে মোটর গাড়ী-নির্ম্মাতারা ক্রেতার নিকট হইতে যতদূর সম্ভব উচ্চ মূল্য আদায় করিতেন; এবং গাড়ীর বিভিন্ন কলকব্জাগুলিও বহুমূল্যে বিক্রয় করিয়া অতিরিক্ত লাভবান হইবার চেষ্টা করিতেন। কিন্তু হেনরী এই পন্থার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, মোটরগাড়ী মুষ্টিমেয় ধনী ব্যক্তির বিলাসের সামগ্রী করিয়া না রাখিয়া, জগতের প্রত্যেক স্বচ্ছল গৃহস্থের কার্য্যোপযোগী করিয়া তুলিবেন এবং তদ্দারা সামাজিক হিতসাধনের পথ যথেষ্ট প্রশস্ত করিয়া দিবেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি মাত্র ২৮ হাজার ডলার (প্রায় নব্বই হাজার টাকা) মূলধন লইয়া ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে Ford Company স্থাপন করেন এবং উহার কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির উপদেষ্টা নিযুক্ত হন।

১৮৯২ খৃষ্টাব্দ হইতে গণনা করিয়া প্রায় ৩০ বৎসরের

মধ্যে ফোর্ডের কারখানায় প্রায় ৫০ লক্ষ Ford গাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছিল। তারপর তিনি কারখানার ও গাড়ী-নির্ম্মাণকৌশলের যথেষ্ট উন্নতিবিধান করিয়া, পরবর্ত্তী তিন বৎসরের মধ্যে আরও ৫০ লক্ষ গাড়ী তৈয়ায়ী করিয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিক্রয় করিলেন। এইগুলি T Modelএর গাড়ী। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের ২৫শে মে পর্য্যন্ত এই ধরণের প্রায় দেড় কোটী গাড়ী বাজারে বাহির হইয়াছিল। অতঃপর Henry এক নূতন ধরণের গাড়ী নির্ম্মাণে মনোনিবেশ করেন। ইহাতে প্রথমতঃ তাঁহার তিন কোটি টাকার অধিক অর্থব্যয় হয়। শেষে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের ২রা ডিসেম্বর তারিখে Model A গাড়ী যুক্তরাজ্যের নানাস্থানে এক-যোগে দেখা দেয়।

Ford গাড়ী বিক্রয়ের ব্যবস্থাও অদ্ভুত। সমস্ত পৃথিবীব্যাপী প্রায় ৫২ হাজার পাইকারের সঙ্গে এই কোম্পানীর ব্যবসায়-সম্পর্ক বর্ত্তমান। এতদ্ব্যতীত প্রায় ৩৮,০০০ খুচরা দোকানদারও Ford গাড়ী বিক্রয় করিয়া থাকেন।

Ford-প্রতিষ্ঠান শুধু মটর গাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। এই কোম্পানী নিজেরাই নানাবিধ অর্ণবযান, বিমানপোত প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া থাকে;

আবার কোম্পানীর নিজেদের লৌহ এবং কয়লার খনিও আছে। জিনিষপত্র নিজেদের যানবাহন সাহায্যেই সরবরাহ এবং স্থানান্তরিত হয়। ফোর্ডের এই বিশ্ববিখ্যাত প্রতিষ্ঠানের অধীনে জগতের সর্ব্বত্র প্রায় ২,২৬,০০০ লোক কাজ করিয়া থাকে। তন্মধ্যে একমাত্র আমেরিকায়ই ২,০০,০০।

যে সকল লোক অর্থ-কষ্টে পড়িয়া অতি অল্প বয়সেই কারখানায় কাজ করিতে আসে, Henry Ford তাহাদের জন্য একটী Trade-স্কুল স্থাপন করিয়াছেন। এখানে কারিগরি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ শিক্ষারও বন্দোবস্ত আছে, যাহাতে তাহাদের ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধার অভাবে কোন প্রকারে ব্যবহত না হয়।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনী ব্যবসায়ী Henry Ford শ্রমিকদিগের দুঃখদারিদ্র্যের কথা ভুলেন নাই। তিনি তাহাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য সর্ব্বদাই তৎপর। Ford কারখানার মত মাহীনা, পেন্সন, ভাতা, চিকিৎসা প্রভৃতি সম্বন্ধে এত সুবিধা পৃথিবীর অন্য কোন কারখানার শ্রমিকগণ উপভোগ করে কিনা সন্দেহ।

৺বটকৃষ্ণ পাল

৺বটকৃষ্ণ পাল নিঃস্ব গন্ধবণিক-পুত্ররূপে জন্ম-গ্রহণ করিয়া, কোটীশ্বর-রূপে মৃত্যুকে বরণ করিয়া গিয়াছেন। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে হাওড়া জেলার শিবপুর গ্রামে ৺লক্ষ্মীনারায়ণ পালের ঔরসে ৺বটকৃষ্ণ পালের জন্ম। শৈশবে পিতৃ-মাতৃহীন অবস্থায় ইংরাজী বিদ্যালয়হীন শিবপুর গ্রামে বটকৃষ্ণ তৎকালীন প্রচলিত সামান্য দেশীয় শিক্ষাই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তারপর তিনি দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে ৮২নং শোভাবাজার বেনেটোলায় মাতুল ৺রামনাথ দের আশ্রয়ে আসিয়া মানুষ হইতে লাগিলেন। ৺রামনাথের নূতন বাজারে একখানি বড় রকমের বেনেতি মশল্লার দোকান ছিল। বালক বটকৃষ্ণ মাতুলের সহিত প্রত্যহ এই দোকানে আসিয়া, ব্যবসার মূল নীতি ও কৌশলগুলি হাতে-কলমে শিক্ষা করিতে লাগিলেন।

ষোড়শবর্ষে পদার্পণ করিলে পর তিনি মাতুলের অনুমতি লইয়া, চীৎপুর রোডে একখানি অহিফেনের দোকান খুলিলেন। ভেজাল মিশাইয়া কারবার না করিলে লাভ হয় না দেখিয়া, এই কারবার তুলিয়া দিয়া, কিছুদিন পরে তিনি বৈদ্যবাটীর হাটে সামান্য পরিমাণ অর্থ লইয়া পাট

অর্থের সন্ধান



স্বর্গীয় বটকৃষ্ণ পাল

কেনাবেচার কার্য্যে নিযুক্ত হন। সুবিবেচনার সহিত এই কার্য্যপরিচালন্ করিয়া অল্প দিনের মধ্যে তিনি সামান্য কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়া ফেলেন। কিন্তু মরণাপন্ন অসুখে তাঁহাকে কিছুকাল শয্যাগত হইয়া থাকিতে হয়। আরোগ্যলাভ করিবার পর, তিনি কলিকাতা শহরে একটা স্থায়ী ব্যবসা খুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

অবশেষে ১৮৫৯ সালে ১২০।১২১নং খোঙ্গরাপটী ষ্ট্রীটের ক্ষুদ্র বাটীতে ৺মাধবচন্দ্র দাঁর উৎসাহ ও সাহায্য পাইয়া একটি ছোটখাট দোকান পত্তন করিলেন। কিছু কিছু বিলাতী ঔষধ আমদানি করিয়া স্বল্প লাভে বিক্রয় করাই তাঁহার দোকানের প্রধান উদ্দেশ্য হইল। সৌভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্ন দৃষ্টি দান করিলেন। সামান্য লেখাপড়া শিখিলে কি হয়, বটকৃষ্টের মধ্যে বিরাট ব্যবসার প্রতিভা সুপ্ত ছিল। এক্ষণে অফুরন্ত উৎসাহ ও কর্ম্মপ্রচেষ্টার নাড়া পাইয়া সে প্রতিভা যেন শতদ্বার উন্মুক্ত করিয়া শতদলের ন্যায় বিকশিত হইয়া উঠিল। কয়েক বৎসরের মধ্যে বটকৃষ্ট পাল তাঁহার প্রতিষ্ঠান বহুগুণ বর্দ্ধিত করিলেন এবং প্রভূত অর্থউপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই 'নিঃস্ব' উপাধি একটা ফুৎকারে জল-বুদ্বুদের মত কোথায় বিলুপ্ত হইয়া গেল।

এই সময়ে তাঁহার ব্যবসায় দ্রুত উন্নতির মুখে। সন ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার উন্নতিশীল ব্যবসায় পরিচালনে সহায়তা করিবার জন্য তাঁহার ষোল বৎসর বয়স্ক জ্যেষ্ঠ পুত্র ভূতনাথ পালকে বিদ্যালয় হইতে ছাড়াইয়া আনিয়া ব্যবসায়ে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। অল্পকাল মধ্যেই ভূতনাথের ব্যবসা সম্বন্ধে অপূর্ব্ব উদ্ভাবন-শক্তি দেখা গেল। কালক্রমে পুত্রের পরামর্শ অনুযায়ী বটকৃষ্ট পাল জগতের বিখ্যাত ঔষধ-প্রস্তুতকারক এবং বিক্রেতাদিগের সহিত দৃঢ়তর ও স্থায়ী সম্বন্ধ স্থাপন করিতে মনোযোগী হইলেন। অচিরেই বি, কে, পাল এণ্ড কোং পাশ্চাত্য দেশের বহু প্রোপ্রায়টরি ও পেটেণ্ট ঔষধ বিক্রয়ের একমাত্র প্রাচ্য-দেশীয় এজেণ্ট-পদে নিযুক্ত হইলেন। তখন আর ১৲০নং খোঙ্গরাপটীর সেই ক্ষুদ্র দোকানে স্থান-সঙ্কুলান না হওয়ায়, ৭নং বনফিল্ড্‌স্ লেনের সুবৃহৎ ত্রিতল বাটীতে ব্যবসা-কেন্দ্র উঠিয়া আসিল; সঙ্গে সঙ্গে লক্ষাধিক টাকার নানা প্রকার য়্যালোপ্যাথিক্ ঔষধ, বিবিধ ডাক্তারী অস্ত্র-শস্ত্র এবং বহুবিধ সরঞ্জাম দ্বারা দোকান-ঘরগুলি সুশোভিত করা হইল। পিতা-পুত্রের সম্মিলিত ব্যবসা-বুদ্ধির বলে ব্যবসায়ের প্রসার ক্রমশঃ আশাতীতরূপে বৃদ্ধি পাইল।

অবশেষে ৭নং বন্‌ফিল্ড্‌স্ লেনের বাটিতেও আর

স্থান সঙ্কুলান হয় না দেখিয়া, বটকৃষ্ট পাল মহাশয় অজস্র অর্থব্যয়ে ১২ নং বনফিল্ড্‌স্ লেনে একখানি প্রাসাদোপম ত্রিতল বাটী নির্ম্মাণ করিলেন। কিন্তু অব্যবহিত কাল পরেই তাহাতেও মাল রক্ষার পর্য্যন্ত স্থান হইতেছে না দেখিয়া, সেই সঙ্গে ২১৬।১৭ নং চীনা বাজার ষ্ট্রীটে (এক্ষণে সিনাগগ ষ্ট্রীট) স্বতন্ত্র গুদাম-বাটী নির্ম্মাণ করাইলেন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে এই উভয় বাটী নির্ম্মিত হইলে, দুইটীতেই পুরা দমে কার্য্য চলিতে লাগিল।

১৯০৪ সালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কলিকাতা শহরের উত্তর অঞ্চলে এদেশীয় ব্যবসায়ীর পরিচালিত ইংরাজি "দাওয়াই-খানার" একান্ত অভাব ছিল। ৺বটকৃষ্ট একটি প্রথম শ্রেণীর "দাওয়াই-খানা" প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য নিজ বসত-বাটীর সংলগ্ন ৯২ নং শোভাবাজার ষ্ট্রীটে কয়েক লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে একখানি বৃহৎ রমণীয় ত্রিতল বাটী নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে ডিস্পেন্সারী স্থাপন করিলেন। এতদিনে শ্যামবাজার, শোভা-বাজার ও বাগবাজার অঞ্চলের অধিবাসীবৃন্দের একটি প্রকাণ্ড অভাব দূর হইল। কিন্তু ইহাতেও কার্য্য সম্পাদনের সম্পূর্ণ অভাব বিদূরিত হইল না। অগত্যা তিনি ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে ১৩ নং বনফিল্ডস্ লেনস্থ জমি ক্রয় করিয়া, তদুপরি আর একখানি সুবৃহৎ ত্রিতল বাটী নির্ম্মাণ করিলেন।

চিকিৎসা-বিভাগের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন করাই ৺বটকৃষ্টের জীবনের মুখ্য ও মহান উদ্দেশ্য ছিল। সুতরাং অচিরেই রিসার্চ্চ লেবরেটরী স্থাপন-উদ্দেশ্যে ১৯১২ খৃষ্টাব্দে স্বীয় বসত-বাটীর নিকটবর্ত্তী ১৮ নং শশীভূষণ সুরের লেনে একখানি দ্বিতল বাটী নির্ম্মাণ করাইয়া, তাহাতে একটি আদর্শ লেবরেটারী স্থাপন করিলেন। শুধু তাহাই নহে, ক্রমে ক্রমে তিনি য়্যালোপ্যাথিক ঔষধ বিক্রয় বিভাগের সহিত দেশীয় ঔষধ, দন্ত চিকিৎসা ও দাঁত বাঁধাই, চক্ষু চিকিৎসা ও চশমা বিক্রয়, শোধিত সুরা বিক্রয়, ফটোগ্রাফী সরঞ্জাম বিক্রয়, মুদ্রণ-যন্ত্র প্রভৃতি নানা বিভাগ একে একে সংযোজিত করিলেন। শুধু ভারতবর্ষের নহে, সমগ্র এসিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার বাণিজ্য-জগৎ বটকৃষ্ট পালের প্রতিপত্তিপূর্ণ নাম-ডাকে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল।

৺বটকৃষ্ট স্বীয় ব্যবসায়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার কয়েক বৎসর পরেই হৃদয়ঙ্গম করেন যে, ইংলণ্ড, ফ্রান্স্, জার্ম্মানী, জাপান, আমেরিকা প্রভৃতি দেশ হইতে প্রতিনিয়ত রাশি রাশি পেটেণ্ট ঔষধ ও উপাদান এদেশে আমদানী হইয়া লক্ষ লক্ষ টাকা বিদেশে চলিয়া যাইতেছে : কিন্তু যথোচিত মূলধন ও তত্ত্বাবধানে এদেশে য়্যালোপাথিক ঔষধ প্রস্তু-

তের কারখানা প্রতিষ্ঠিত করিলে, একদিকে যেমন ব্যক্তিগতভাবে অধিকতর লাভবান হওয়া যায়, অন্যদিকে তেমনি দেশের জনসাধারণও যথেষ্ট উপকৃত হইতে পারে। নানা কারণে তিনি এই প্রস্তাবটি কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ পুত্র ৺ভূতনাথ পাল উহা কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন। এখনও উহা সগৌরবে পরিচালিত হইতেছে। গবর্ণমেণ্টও এই ফ্যাক্টরীতে প্রস্তুত ঔষধ প্রচুর প্ররিমাণে ক্রয় করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বোক্ত বিভিন্ন বিভাগসমূহ স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়ের আয়তন বহুগুণ বর্দ্ধিত হওয়ায়, বৃদ্ধ, ৺বটকৃষ্ট তাঁহার তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত হরিশঙ্করকে (এক্ষণে সার হরি শঙ্কর পাল কে, টি,) ব্যবসায়ে নিযুক্ত করিলেন। তিনিও স্বীয় সুতীক্ষ্ণ মেধাশক্তিবলে অল্পদিনের মধ্যেই যোগ্যতার পরিচয় প্রদর্শন করিলেন।

কিছুদিন পর উত্তর বিভাগের শাখা ঔষধালয়ের ভার চতুর্থ পুত্র শ্রীযুক্ত হরিমোহন পালের উপর অর্পিত হইয়াছিল। ইদানীং তিনি ১৬নং বনফিল্ডস্ লেনের কার্য্যালয়ের তত্ত্বাবধায়ক হইয়াছেন।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের তৎকালীন [illegible] প্রতিনিধি

এবং গবর্ণর জেনারেল মহামান্য লর্ড মিণ্টো বাহাদুর মেসার্স বটকৃষ্ট পাল এণ্ড কোম্পানীকে স্বীয় 'ড্রগিষ্টস্ এণ্ড্ কেমিষ্ট' পদে নিযুক্ত করেন। পরে ইঁহারা মহামহিম প্রিন্স্ অব্ ওয়েল্‌সেরও ঔষধ-সরবরাহকারক নিযুক্ত হইয়াছেন।

সাধু বটকৃষ্ট বিশ্বপ্রকৃতি কর্ত্তৃক ব্যবসা-জগতে যে মহান্ আদর্শ বিস্তারের ভারপ্রাপ্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা কার্য্যে পরিণত করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি দীন হীন আর্ত্তগণকে দুই হস্তে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করিতেন। কোটি কোটি টাকার মালিক হইয়া, তিনি শিশুর ন্যায় সরল, ধর্ম্মপ্রচারকের ন্যায় নিরহঙ্কার এবং মেরুআবিষ্কারকের ন্যায় কষ্টসহিষ্ণু ও অধ্যবসায়ী ছিলেন। প্রকৃতিদত্ত শিক্ষা-দীক্ষাবলে সাধু বটকৃষ্ট সামান্য অবস্থা হইতে কিরূপে উন্নতির অভ্রভেদী তুঙ্গ শৃঙ্গে সমারূঢ় হইয়াছিলেন, তাহার প্রত্যেক অর্থ-সন্ধানীর শিক্ষার বিষয়। বটকৃষ্ট পালের স্বভাব পবিত্র ছিল, বিলাস-ঐশ্বর্য্যের প্রতি ঘোর বিতৃষ্ণা ছিল, নৈতিক সাহস ও ধর্ম্মভীরুতায় হৃদয় পূর্ণ ছিল। আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু-বান্ধব, স্বজাতি ও স্বদেশবাসীর প্রতি তাঁহার অগাধ সহানুভূতি ছিল। তিনি যেমন অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিতেন, তেমনি অর্থের সুনিয়োগ

করিতে ও সৎ পথে তাহা ব্যয় করিতেও জানিতেন। আত্মশক্তিতে অসীম বিশ্বাস, কর্ম্মে একাগ্রতা ও বিচক্ষণ ব্যবহারিক বুদ্ধি—তাঁহার জীবনের উন্নতির তিনটি প্রধান সোপান ছিল।

১৩২১ সালের ২৯ জ্যৈষ্ঠ (১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ১২ই জুন) শুক্রবার এই সুপ্রসিদ্ধ কর্ম্মবীর ৺কাশীধামে পরলোক গমন করেন।

জেম্‌সেদ্‌জী টাটা

১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে বরদা রাজ্যের অন্তর্গত নাভ্‌সারিতে এক বর্দ্ধিষ্ণু পার্শী পরিবারে টাটার জন্ম হয়। নাভ্‌সারিতেই তাঁহার শৈশব শিক্ষা আরম্ভ হইয়াছিল। বাল্যাবস্থায় বিদ্যালয়ে পড়িতে পড়িতে তিনি ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিতে শিখেন, শীকারে ও পাটীগণিতের মানসাঙ্কে ব্যুৎপত্তিলাভ করেন। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে ১৩ বৎসর বয়সে উচ্চ শিক্ষার জন্য তাঁহাকে বম্বাই পাঠাইয়া দেওয়া হয়। বম্বাইএ আসিয়া জেম্‌সেদ্‌জী যেন একটা নূতন জগতে প্রবেশ করিলেন। তিনি সেখানকার এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্ স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন।

১৮৫৮ তাঁহার বিদ্যাশিক্ষা শেষ হয়। ছাত্র-জীবনে তিনি বিশেষ কোনও কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই।

জেম্‌সেদ্‌জীর পিতার মাঝারি রকমের একটি ব্যবসা ছিল। কলেজ ছাড়িয়া, তিনি পিতার এই ব্যবসায়ে যোগদান করেন। চীন হইতে আফিং আমদানীর ব্যবসা তখন পার্শীদের একরূপ একচেটিয়া ছিল। টাটা পিতার নিকট কিছু কাজ শিখিয়া, হংকং চলিয়া গেলেন এবং সেখানে এই ব্যবসা খুব ভাল করিয়া শিক্ষা করিলেন। এই শিক্ষার ফলে তাঁহার বাণিজ্য-বুদ্ধি আশ্চর্য্য রকম খুলিয়া গেল।

ইহার কিছুকাল পরে আমেরিকাতে যুদ্ধ বাধিল। অল্প সময়ের মধ্যেই বম্বাই তূলা-ব্যবসায়ের একটি প্রকাণ্ড কেন্দ্র হইয়া উঠিল। বম্বাইয়ের বণিকগণ এই ব্যবসা-দ্বারা প্রচুর লাভ করিতে লাগিলেন। টাটা কোম্পানী সুবিখ্যাত প্রেমচাঁদ রায়চাঁদের সঙ্গে মিলিত হইয়া,এই ব্যবসা আরম্ভ করিলেন। লণ্ডনে একটা ব্যাঙ্ক খোলা হইবে বলিয়া জেম্‌সেদ্‌জীকে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে চীন হইতে বম্বাইয়ে ফিরিয়া আসিতে হয়। টাটা লণ্ডনে গিয়া, প্রথমতঃ তূলা ব্যবসায়ের পর্য্যবেক্ষণ-কার্য্যে নিযুক্ত রহিলেন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার যুদ্ধ হঠাৎ শেষ হইয়া গেল।

অর্থের সন্ধান—



স্বর্গীয় জেম্‌সেদজী টাটা

যাঁহারা তুলার ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহারা দেউলিয়া হইয়া পড়িলেন। লণ্ডনে টাটা কোম্পানীর যে শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, জেম্‌সেদ্‌জীকে তাহা বিক্রয় করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিতে হইল। বম্বাই নগরে তাঁহাদের যে কারবার ছিল, তাহা কোনমতে টিঁকিয়া রহিল।

টাটা কোম্পানী অন্য প্রণালীতে ব্যবসায়ের এই দারুণ ক্ষতিপূরণ করিয়া লইবার চেষ্টা আরম্ভ করিলেন। জেম্‌-সেদ্‌জী টাটা তখন নূতন কোন ব্যবসায়ে হাত দেওয়া যায় কিনা, তাহাই চিন্তা করিয়া দেখিতে লাগিলেন। কয়েক-জন অংশীদার লইয়া তিনি সস্তা দরে একটা তেলের কল কিনিয়া, উহাকে অচিরে কাপড়ের কলে পরিণত করিলেন। এমন সময়ে কেশোজী নায়ক নামে একজন দালাল এই মিলটী খুব বেশী দামে কিনিতে চাহিলে, উহা তাঁহার নিকট বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন। অল্পদিনের অভিজ্ঞতা দ্বারাই টাটা বুঝিতে পারিলেন যে, বম্বাই নগ-রীতে কাপড়ের কল চালাইয়া খুব লাভ করা যাইবে। তিনি নিজে একটি কল চালাইবেন স্থির করিলেন। কিন্তু টাটা হাতে-কলমে গভীর জ্ঞান লাভ না করিয়া কোন কাজে হাত দিতেন না। তিনি মনে করিলেন, ইংলণ্ডে কাপড়ের কলগুলি কি ভাবে চালান হয়, তাহা দেখিয়া

আসা দরকার। তদনুসারে তিনি বম্বাই হইতে ম্যান্‌-চেষ্টার অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

কাপড়ের কল সম্বন্ধে পাকা অভিজ্ঞতা সহ ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া আসিয়া, ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারী টাটা নাগপুরে একটি সুসজ্জিত কাপড়ের কল স্থাপন করিলেন। এই তারিখ মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জন্ম-দিন বলিয়া, এই মিলের নাম "এম্প্রেস্‌ মিল' রা া হইল। কলে যখন প্রচুর পরিমাণে কাপড়-চোপড় প্রস্তুত হইতে লাগিল, টাটা তখন দেখিতে লাগিলেন, কোথায় কোন্‌ বাজারে লইলে মিলজাত দ্রব্যাদি বিক্রয়ের বেশী সুবিধা হইতে পারে। ইহা ঠিক করিবার জন্য তিনি চারিদিকে লোক প্রেরণ করিলেন।

কৃতকার্য্যতার মূলে ছোট বড় অনেকগুলি কারণ-কার্য্যপরম্পরা বর্ত্তমান থাকে; তাহার মধ্যে যে কোন একটির জন্য সকল কার্য্য পণ্ড হইয়া যাইতে পারে। এসব কথা টাটা যে রকম বুঝিতেন, অন্য কেহ সেরূপ বুঝিত না। তিনি জানিতেন, মানুষ যে কাজ করে, সেই কাজ যদি তাহার পছন্দ না হয়, তাহা হইলে ক্রমশঃ তাহার কাজ করিবার উৎসাহ চলিয়া যায় এবং কাজটিও সফল হয় না। অনেক বেতনভুক্‌ কর্ম্মচারী কলের পুতুলের

মতন কাজ করিয়া যায় ; কাজের মধ্যে তাহারা কোনরূপ মৌলিকত্ব বা আনন্দ খুঁজিয়া পায় না, বরং উহা তাহাদের নিকট অনেক সময়ই বিষবৎ বোধ হয়। এই সমস্ত লোকের নিকট হইতে খুব ভাঁল কাজ আদায় করা দুরাশা মাত্র। তাই তিনি মিলের কর্ম্মচারীদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য অনেকগুলি পুরস্কারের বন্দোবস্ত করিলেন। ইহার ফলে কর্ম্মচারিগণের মধ্যে ভাল কাজ করিবার জন্য একটা প্রতিযোগিতার ভাব দাঁড়াইয়া গেল। বৎসরের শেষে কার্য্যের পরিমাণ বুঝিয়া, সকল বেতনভোগীকে লাভের একটা অংশ বণ্টন করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা টাটাই বোধ হয় প্রথম এদেশে প্রবর্ত্তন করিলেন।

টাটার বুদ্ধি নানাদিকে খেলিত। তিনি সর্ব্বদাই এক ঢিলে দুই পাখী মারিবার চেষ্টা করিতেন। অর্থাৎ তিনি এমন সব কাজের উপায় উদ্ভাবন করিতেন, যাহাতে তাঁহারও কাজ হয় এবং অন্য দশ জনেরও উপকার হয়। শিক্ষিত যুবকদিগের মোটা মোটা বেতনে গ্রহণ করিয়া, তিনি হাতে-কলমে ভাল করিয়া কাজ শিখাইতেন; পরে তাহাদের মধ্য হইতে যোগ্যতম ব্যক্তিদিগকে বাছিয়া বাছিয়া মিলের দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন। এক সময়ে ধরমসী মিল্ নিলামে উঠিল। বম্বে প্রেসিডেন্সিতে

তখন উহা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ মিল্ ছিল। টাটা উহা সাড়ে বার লক্ষ টাকা দিয়া কিনিলেন। সকলেই বলিতে লাগিল, টাটা খুব সস্তা দামে মিল্‌টি কিনিয়াছেন বটে; কিন্তু উহাকে পুনরুজ্জীবিত করা দুঃসাধ্য। সত্যই আপাত-দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে, ধরমৃসী মিল্‌টি ক্রয় করা তাঁহার জীবনের একটা মস্ত ভুল হইয়াছিল; কিন্তু লোকসানগ্রস্ত ধরমৃসী মিল্‌কে সঞ্জীবিত করাই টাটার জীবনের এক অক্ষয় কীর্ত্তি! তাঁহার অধ্যবসায় দেখিয়া মানুষ অবাক্ হইয়া গিয়াছিল। অন্য কোন মিল্-পরিচালক হইলে, কবে হাল্ ছাড়িয়া দিতেন! কিন্তু টাটা হঠিবার পাত্র ছিলেন না। যেখানে পরাজয়ের সম্ভাবনা ষোল আনা, সেখানে জয়লাভ করিবার জন্য অদম্য আকাঙ্ক্ষায় তাঁহার হৃদয়-মন ভরিয়া উঠিত। তিনি যাহাতে একবার হাত দিতেন, তাহাতে সোণা না ফলাইয়া ছাড়িতেন না।

টাটার দুই মিলই বেশ ভালরকম চলিতে লাগিল। টাটা এখন লক্ষ্মীর বর-পুত্র। কোটি টাকার মালিক হইয়া কিন্তু তিনি পায়ের উপর পা দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া রহিলেন না, অথবা নিশ্চেষ্ট আরামে বিলাস-বৈভবের স্রোতে গা ঢালিয়া দিলেন না। অন্যান্য ধনীদের মত ধনোপার্জ্জন-কেই তিনি জীবনের ধ্রুবতারা জ্ঞান করেন নাই। তিনি ধন

উপার্জ্জন করিতে ও ধনের সদ্ব্যবহার করিতে জানিতেন। অর্থদ্বারা যাহাতে দেশের হিতসাধন করা যায়, সর্ব্বদা তাঁহার সেই চেষ্টা ছিল। সাধারণ মানুষের মত তাঁহার জীবন মহদুদ্দেশ্য-হীন ছিল না। কতকগুলি কাজের কল্পনা তাঁহার মনের মধ্যে সর্ব্বদা জাগ্রত থাকিত এবং সকল কাজ যাহাতে সুসম্পন্ন হয়, তিনি সে বিষয়ে একান্ত যত্নবান থাকিতেন।

দরিদ্র ছাত্রগণ ভারতে শিক্ষা সমাপন করিয়া, যাহাতে বিদেশে গিয়া উচ্চ শিক্ষালাভ করিতে পারে, তজ্জন্য মহামতি জেমসেদ্‌জী টাটা ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে একটি ছাত্রবৃত্তি বা স্কলারশিপ ফণ্ড স্থাপন করেন। এই ফণ্ডের টাকা হইতে প্রতি বৎসর দুইটি করিয়া নির্ব্বাচিত ছাত্র অধ্যয়নার্থ ভারতের বাহিরে গমন করে এবং সমস্ত শিক্ষাকাল পর্য্যন্ত সাহায্য পায়। যাহার যে বিষয় ইচ্ছা, সে সেই বিষয়ই শিখিয়া আসিতে পারিবে; বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন, বাণিজ্য, বা অন্য যে-কোন বিষয় শিখিবার জন্য স্কলারশিপের টাকা পাওয়া যায়।

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে টাটার অন্তিম ইচ্ছানুযায়ী বহুতর অর্থব্যয়ে "The Indian Institute of Research" (ভারতীয় গবেষণাগার) নামে একটি বিরাট উচ্চশিক্ষা-

মন্দির স্থাপন করা হয়। সার পালিতের স্মৃতিপূত 'সায়েন্স কলেজের' ন্যায় ইহাও টাটার একটা অবিনশ্বর কীর্ত্তি। ভারতীয়গণ যাহাতে বিভিন্ন শাখার বিজ্ঞান সম্বন্ধে উচ্চতম জ্ঞান-লাভের সহিত স্বাধীনভাবে নূতন নূতন পরীক্ষা ও গভীর গবেষণা করিতে পারে, তদুদ্দেশ্যে এই ইন্‌স্‌টিউট্‌টি গঠিত হইয়াছে।

এই বিজ্ঞান-মন্দিরে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি শিখিবার বন্দোবস্ত আছে। যথা—Higher Knowledge in (1) Scientific and Technical; (2) Medical, and (3) Philosophical and Educational subjects; অর্থাৎ (১) বিজ্ঞান ও শিল্প-বিজ্ঞান; (২) আয়ুর্ব্বেদ বা ডাক্তারী এবং (৩) দর্শন ও শিক্ষাবিষয়ক উচ্চতর জ্ঞান। এই মন্দির-সংলগ্ন এক-একটি বিরাট পুস্তকাগার, যাদুঘর ও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার আছে।

টাটার অন্যান্য কীর্ত্তিকলাপ সাধারণ মানুষ না জানিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার জগদ্বিখ্যাত লৌহ-কারখানার কথা সকলেই জানেন। এই লৌহ-কারখানা তাঁহার জীবনের অক্ষয় কীর্ত্তি এবং ইহা ভারতবর্ষে সত্যই এক অভিনব ব্যাপার। আমাদের দেশে বহু প্রাচীন কাল হইতে লোহার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বর্ত্তমান

বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে লোহ উত্তোলন ও লৌহজাত গুরুভার দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিবার কৌশল এখানে অজ্ঞাত ছিল। টাটা বহুদিন হইতে একটি লৌহের কারখানা খুলিবার চেষ্টায় ছিলেন। প্রায় পঞ্চদশ বৎসর কাল অনুসন্ধান ও অক্লান্ত চেষ্টার ফলে, কলিকাতা হইতে ১৫৫ মাইল দূরে সাঁকচী নামক স্থানে কয়েক ক্রোশ জমি ক্রয় করেন এবং এইস্থান হইতে প্রচুর খনিজ লৌহ আবিষ্কার করেন। অল্পদিন পরে সাঁকৃচীর অনতিদূরে কালি-মাটিতে (অধুনা টাটানগর নামে পরিচিত) ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে একটি মাঝারি আকারের লৌহকারখানার ভিত্তি স্থাপন করেন। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দেই কার্য্য অসমাপ্ত রাখিয়া তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার সুযোগ্য পুত্র ডোরাব্‌জী টাটা (এক্ষণে 'সার্' হইয়াছেন) পিতৃ-পরিত্যক্ত কার্য্যভার সম্পূর্ণ করিয়া তুলিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

অবশেষে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে পূর্ণউদ্দমে কারখানার সকল বিভাগের কার্য্য আরম্ভ হইল। ক্রমশঃ কাজ এত বাড়িয়া যাইতে লাগিল যে, পুরাতন কারখানায় আর কুলাইয়া উঠিল না; তাই পুনরায় আরও একটা নূতন বৃহত্তর কারখানা প্রস্তুত করিতে হইল। এই নূতন কারখানা

পুরাতন কারখানার প্রায় দ্বিগুণ। বর্ত্তমানে সাঁক্‌চী ও কালিমাটি প্রকাণ্ড শহরে পরিণত হইয়া গিয়াছে। এই কারখানা-সংপৃক্ত ৪০।৫০ হাজার লোক এই স্থানে বসবাস করিতেছে। এই কারখানা-শহরটি সত্য সত্যই একটি দেখিবার জিনিষ। দেশ-বিদেশ হইতে কত লোক আসিয়া ইহা পরিদর্শন করিয়া যায়। লোহার রেল, কড়ি, বরগা, থাম, রেলিং, ক্রেন, মালগাড়ী, পাত্র, প্লেট প্রভৃতি ও সর্ব্ববিধ লৌহনির্ম্মিত ছোটবড় অস্ত্র ও যন্ত্র নির্ম্মাণে টাটার কারখানা পৃথিবীজোড়া সুনাম কিনিয়াছে। টাটা-প্রস্তুত মাল শুধু ভারতে নহে—বিদেশেও সমাদরের সহিত ব্যবহৃত হইতেছে।

টাটার আর একটি অক্ষয় কীর্ত্তি—তাঁহার হাইড্রো-ইলেক্‌ট্রিক পাওয়ার সাপ্লাই কোম্পানী। ইহা পৃথিবীর মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য বৈজ্ঞানিক ব্যাপার। তাড়িৎ বিজ্ঞান ও এঞ্জিনিয়ারিং সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান না থাকিলে, ইহা বুঝা একরূপ অসম্ভব। সুতরাং এক্ষণে ইহা ভালরূপে বুঝিবার চেষ্টা করিয়া লাভ নাই

টাটার ব্যক্তিগত জীবনের কথা আমরা বেশী কিছু জানি না। তিনি পাকা ব্যবসায়ী, বিখ্যাত ধনী, আদর্শ সংসারী, অকৃত্রিম দেশ-সেবক ও উৎকৃষ্ট সাহিত্যিক

ছিলেন। মিশরের চাষা কি উপায়ে উৎকৃষ্ট তূলার চাষ করে, তৎসম্বন্ধে বিস্তৃত অভিজ্ঞতা এবং সেই প্রণালী এদেশে প্রবর্ত্তিত হওয়ার সপক্ষে সুন্দর যুক্তিগুলি, তিনি একখানি পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। রেশমের চাষেও তাঁহার অসীম উৎসাহ ছিল। মহীশূরে তিনি অনেকবার ব্যাপকভাবে এই চাষের চেষ্টা করিয়াছিলেন।

টাটার বাগান করিবার বড় সখ ছিল। নাভ্‌সারীতে তাঁহার বাড়ীতে তিনি একটি ছোটখাট আদর্শ বোটানিক্যাল গার্ডেন (Botanical Gorden) রচনা করিয়া তুলিয়াছিলেন। প্রভূত ধনের অধিকারী হইয়াও টাটা অত্যন্ত মিতাচারী ছিলেন। মদ্যপানের তিনি ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। যাহাতে আমাদের দেশে মদ্যপান নিবারিত হয়, তিনি সর্ব্বদা সে বিষয়ে সচেষ্ট ছিলেন। রাজনৈতিক বিষয়ে টাটা সাধারণতঃ কোনো সুস্পষ্ট মন্তব্য প্রকাশ করিতেন না। রাজনীতি সম্বন্ধে তাঁহার মত অত্যন্ত উদার ছিল বলিয়াই বোধ হয়।

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ১৯শে মে তারিখে জার্ম্মাণীর নাহিম শহরে ৬৫ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। নাম কিনিবার স্পৃহা তাঁহার ছিল না বলিয়াই এই বিরাট কর্ম্মী সারা

জীবন লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া, দেশের কাজ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার গৌরবে আজ ভারতবর্ষ আপনাকে গৌরবান্বিত বোধ করিতেছে। পৃথিবীর কর্ম্মিমণ্ডলীর ইতিহাসে জেম্‌সেদ্‌জী টাটা অমর হইয়া রহিয়াছেন!